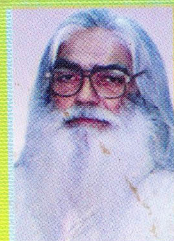
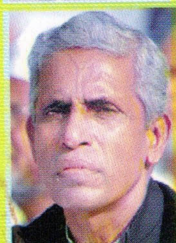
নিউক্লিয়াস-বিএলএফ-স্বাধীনতা





বাঙালির

জাতীয় রাষ্ট্র

কাজী আরেফ আহমেদ

[আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান]

সম্পাদনায়
স্কোয়াড্রন লিডার আহ্‌সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত)

বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' বাস্তবতায় রূপ পেলো '৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর। শত শত বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানিতে একটি জাতিসত্তার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে যেতে যেতে প্রাণ ফিরে পেলো '৭১-এ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে আদি ভারতীয়/হিন্দু সভ্যতার আড়ালে ঢেকে পড়া 'বাঙালি সভ্যতা'ও বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল। প্রশস্ত হলো বাঙালির 'তৃতীয় জাগরণে'র পথ। বাঙালি, বাংলাদেশ ও 'বাঙালি সভ্যতা' এখন নিজস্ব সত্তা নিয়ে এগিয়ে চলছে সামনে বিশ্ব-সমাজের লক্ষ্যে। নি:সন্দেহে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কিন্তু কী করে এই অসাধারণ ঘটনার বাস্তবায়ন সম্ভব হলো? প্রতিপক্ষের ভুলে বা দুর্বলতায়? কারো বদান্যতা বা কূটচালের কারণে? কারো একটি ভাষণে বা কারো বেতার ঘোষণায়? অন্যদিকে, স্বাধীনতা এলো কিন্তু এর গন্তব্য কোথায়? এটি আবার কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবে না তো? – ইত্যাকার প্রশ্ন, সন্দেহ এবং আশংকা আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে বৈকি!

কাজী আরেফ আহমেদ তাঁর 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' বইটিতে এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন এবং দিয়েছেনও। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠকদের গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মূল বডি 'নিউক্লিয়াস'এর তিন নায়ক ছিলেন– সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ স্বয়ং। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এ জাতির ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জালও বুনেছেন বইটিতে।

ঘটনার আড়ালেও ঘটনা থাকে, যা সহজে কারো চোখে পড়ে না। যেমন 'জয় বাংলা' সহ স্বাধীনতার স্লোগানমালা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' এর ডাক, প্রভৃতি সিদ্ধান্ত কে, কখন, কোথায়, কিভাবে নিয়েছিলেন এবং কি করে এসব কার্যকরী করা হয়েছিলো? এসব বিষয়ে সকল বিভ্রান্তির অবসান করে গেছেন কাজী আরেফ আহমেদ তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণে। এ দুরূহ এবং দুর্লভ কাজটি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিলো কারণ তিনি প্রতিটি ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এ তথ্যগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক বা নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনায় কাজে লাগবে। পাঠকও তাঁর কৌতূহল মিটিয়ে স্বস্তি পাবেন।

এতোদিন সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওপর যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ', 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ' এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ তে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, এবং '৬ দফা' ও '১১ দফা' আন্দোলন এবং '৬৯এর 'গণঅভ্যুত্থানে'র মূলে কারা বা কোন শক্তি এককভাবে আন্দোলন-সংগ্রামের পরিকল্পনাকারী ছিলো? এ বিষয়টি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের ভূমিকাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এতোদিন এসব প্রশ্নের উত্তর না খোঁজার কারণে '৬২ থেকে '৭১ পর্যন্ত অগ্নিঝরা কর্মকাণ্ডের কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা না দিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সরকারি মহল এবং 'একচোখা' লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেনো '৭১ এর নয়মাসের যুদ্ধ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তুচ্ছ একটা কিছু। ব্যাপারটা যেনো এমন যে, নয়মাসের যুদ্ধ না হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আটকে থাকতো না। শত শত বছরের পরাধীনতার বিরুদ্ধে বাঙালির একমাত্র সফল স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না দিয়ে তারা পাকিস্তানি 'তাহজিব-তমুদ্দুন' রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। এই আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পেতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তারা তোষামোদির যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনো করছেন তা আরো বেশি লজ্জাজনক। এই প্রতিপাদ্যকে মাথায় রেখেই এতো বছর ধরে দেশ চলছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য '৭১এর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গটি আনা হলেও বাস্তবে ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সময়কার চিন্তা-ভাবনা ও কাঠামো বজায় রেখেই স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে।

কাজী আরেফ আহমেদের 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' বইটিতে এই প্রথম '৬২ থেকে '৭১ পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহের সঠিক চিত্র উঠে এসেছে। নতুন প্রজন্ম এ বই থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতার মূলসূত্র খুঁজে পাবেন আশা করি।

সম্পাদক

 মুক্তিযুদ্ধ  আর্কাইভ

বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র

কাজী আরেফ আহমেদ

[আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান]

সংগ্রহ এবং সঙ্কলন: স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত)

National State of the Bangali (Bengali)

(Bangladesh & Freedom War of '71: Firsthand Experiences of a Valiant Freedom Fighter and Political Leader.)

Kazi Aref Ahmed

Collected & compiled by Sqn Ldr Ahsanullah (Retd).

প্রথম প্রকাশ	:	জুলাই ২০১৪
প্রকাশক	:	**মো. সাখাওয়াত হোসেন** ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক (আইএইচএন) বাড়ি # ৩৪, রোড # ১৬ (পুরাতন ২৭) ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।
কম্পিউটার কম্পোজ	:	**জুবাইদা মিজান (তনিমা) ও হুমায়ুন কবির**
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ	:	**আসিফ ইকবাল**
গ্রন্থস্বত্ব	:	**রওশন জাহান সাথী**
সম্পাদনায়	:	**স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত)**
পরিবেশক	:	**অঙ্কুর প্রকাশনী**
মুদ্রণ	:	**অঙ্কুর প্রকাশনী**
মূল্য	:	**২৫০.০০ টাকা** **১০ ডলার** **৭ পাউন্ড**

ISBN

উৎসর্গ

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে
যাঁরা আড়ালে থেকে শুধু দিয়েই গেছেন,
তাঁদেরকে

সূচিপত্র



কথা ছিলো ...

কথা ছিলো আমরা তিনজনে মিলেই লিখবো।

শিশুর জন্ম একবারই হয়। স্বাধীনতাও জাতির জীবনে একবারই আসে। যে জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা লাভের সময়কালে অবস্থান করে তাদের অবস্থানগত বাস্তবিক অস্তিত্ব অন্য সময়কার মানুষদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন।

বাঙালির জীবন-বিকাশের ইতিহাস দীর্ঘকালের। সুলতানী আমলে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। এই সুলতানী আমলেই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর 'অঙ্কুর' রোপিত হয়। এ সময়েই বাংলা 'রাজকীয় ভাষা' হিসেবে ব্যবহৃত হতে আমরা দেখি। তারই ধারাবাহিকতায় পনের-ষোল শতকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) এবং শ্রী চৈতন্যদেবের (১৪৬৮-১৫৩৪) সময়কালে ইসলামী সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাঙালির জীবন ধারায় 'প্রথম জাগরণ' সূচিত হয়। তার তিনশ' বছর পরে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে (ইংরেজি শিক্ষা, ইউরোপীয় ভাবধারা ও রাজনীতি এবং বিজ্ঞান চর্চা) ঘটে 'দ্বিতীয় জাগরণ', যার নাম 'বেঙ্গল রেনেসাঁ'। এর পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ। কিন্তু এই দুই জাগরণ ঘটে কেবলমাত্র সমাজের বিত্তবান, অভিজাত ও উঁচু শ্রেণির মধ্যে এবং সেখানেই ছিলো সীমাবদ্ধ। কোনো সুদূর প্রসারী পরিবর্তন স্থায়িত্ব পায় তখনই যখন তা সমাজের প্রতিটি শ্রেণি এবং পর্যায়কে ছুঁয়ে যায়। এ দুই জাগরণ বৃহত্তর বাঙালি সমাজের ভিত্তিমূলে যেহেতু কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, তাই ছিলো স্বাভাবিকভাবেই ক্ষণস্থায়ী।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ভারতীয় বাঙালি এবং পাকিস্তানি বাঙালি অথবা হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি হিসেবে পরিচয়কে বাঙালির সর্বশেষ পরিচিতি বলে অনেকে ধরে নিয়েছিলো। এ উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির জগত এবং পৃথিবীর

অন্যান্য স্থানের গবেষকদের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। বাঙালি আর কোনোদিন স্বীয় পরিচিতি নিয়ে পৃথিবীর বুকে অবস্থান নেবে এটা ছিলো তাঁদের কল্পনাতীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলসহ আরো অনেকে তাঁদের দর্শন ও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। ১৯৩৪ সালে বিহার প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন– 'ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারতের অংশ হলেও কার্যত: বাংলা ও বাঙালি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী'। এর পরেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হলো বহুকাল। বাঙালির রাষ্ট্রব্যবস্থা বাঙালি জীবনে 'তৃতীয় জাগরণ'-এর পথকে প্রশস্ত করে দিলো। তৃতীয় জাগরণ-এর যে পর্যায়কাল এখন চলছে, তা বাঙালির জীবন ও সমাজের ভিত্তিমূলে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণেই, যে বাঙালি এক সময় ছিলো মাছে-ভাতে কৃষিজীবী বাঙালি, আজ তারা পেশাজীবী এবং পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো পেশায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ এক নব পরিচিতি যার মাধ্যমে বাঙালি অন্য যে কোনো জাতির সমতুল্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ, ফরাসি, স্প্যানিশ প্রভৃতি পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর অধীনস্থ দেশসমূহের স্বাধিকার বা স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। আলজেরিয়া, কিউবা, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, প্যালেস্টাইন, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ভারতসহ বহু দেশ তাদের দখলদার প্রভুদের হঠিয়ে নিজ নিজ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয় এবং আজো অনেকে যুদ্ধরত। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব এবং বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইসমূহের ঘটনা প্রবাহ এবং সমকালীন বিশ্বে স্বাধীনতা সংগ্রামরত বিভিন্ন জাতিসমূহ ও তাদের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ সচেতন বাঙালি তরুণ সমাজকে ভেতরে ভেতরে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে।

ব্রিটিশ উদারনৈতিক সমাজের গাছ বেয়ে ভারতীয় উচ্চবিত্তদের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দলীয় রাজনীতির ঘাঁটি তৈরি হয়। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারার আদলে 'পরজীবী' আকারে যেসব দল লতাপাতা হিসেবে গজিয়ে ওঠে তা ছিলো একদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে আপোষ-রফা এবং অন্যদিকে 'শেকড়হীন' হয়ে বেঁচে থাকা। এ হলো এদেশের

'প্রথম ধারার রাজনীতি'। এরই সমান্তরালে বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (দেশজ ভাষা, সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ-পাকিস্তানি শাসন বিরোধী বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড) নিয়ে চলে আপোষহীন 'দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি'। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের নজির নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য অহিংস ও সহিংস উভয় সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এ ধারার রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন গোপন ('অনুশীলন' ও 'যুগান্তর') এবং প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন ('স্বরাজ পার্টি' ও 'কৃষক-প্রজা পার্টি')। ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতার চেতনাও (নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং শেরে-বাংলার 'লাহোর প্রস্তাব') এ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত হতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। বাঙালির রাজনৈতিক সাহিত্য (রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত প্রমুখ) এবং লোকজ দার্শনিক ফকির লালন শাহ'র দিগদর্শন, লোকায়ত সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধারার আধ্যাত্মিক দর্শন (নাটক, যাত্রা-পালা, চলচ্চিত্র, লোক-কবি ও আউল-বাউল-সুফি-সাধক প্রভৃতি) এ অঞ্চলের মানুষের সমাজ চিন্তা-মননে বাঙালির নিজস্ব অনুভূতিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালের পর মাতৃভাষার জন্য আমাদের লড়াই এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভাষা আন্দোলন আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে সুরক্ষিত করার এক মহান অধ্যায়। তারই ধারাবাহিকতায় আবির্ভূত হয় '৬২'র 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। '৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯–'৭০এ ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬৯'র 'গণঅভ্যুত্থান' ছিলো বাঙালির স্বতন্ত্র পরিচয়ের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপ। '৬৯ সালে 'বি.এল.এফ' ('নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক উইং) গঠন, '৭০'র নির্বাচন, '৭১এ 'অসহযোগ' আন্দোলন ও পরিশেষে '৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় 'দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি'র চূড়ান্ত সফলতার ইতিহাস। এ সবই ছিলো ব্রিটিশ-পাকিস্তানি সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রামী ঘটনাবলীর আবর্তে শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত জনগণ শাসিত এক নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

আমার মাঝেমধ্যে এখন ভাবতে অবাক লাগে যে, আমরা তিনজন (বয়স ১৯ থেকে ২১) কোন সাহসে বাঙালির ইতিহাসকে তার সঠিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে 'নিউক্লিয়াস' এবং পরে 'বি.এল.এফ' ও 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠনের মাধ্যমে গোটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সফল আন্দোলন ও সংগ্রামের মন-মানসিকতা গড়ে তুললাম। সেই সার্থক আন্দোলন ও ঘটনাবলীর পাশ কাটিয়ে আমাদের দেশের 'একচোখ'ওয়ালা বুদ্ধিজীবীরা '৭১র মার্চের

আগের দিনও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পেলেন না– এও আমাদের জন্য এক ধরনের লজ্জাকর কাহিনী।

শুধু বুদ্ধিজীবীরাই নন, সে সময়ের আওয়ামী লীগসহ ছোট-বড় কোনো রাজনৈতিক দলই মার্চ মাসের আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে সমর্থন করেনি; এমনকি তাদের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেও স্বাধীনতা বিষয়টি আনতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থানটি ছিলো একেবারেই ভিন্ন। '৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভের পরই বঙ্গবন্ধুকে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ' সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন থেকে তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে শুধু আপোষহীনই ছিলেন না, 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ' এর কর্মকাণ্ড সমর্থন করতেন এবং যে কোনো পদক্ষেপে উৎসাহ যোগাতেন।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ দলগতভাবে স্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। এমনকি ১৯৬৯ সালের আগে বঙ্গবন্ধুও 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ' এর কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে জানতেন না। জাতীয় স্লোগান 'জয়বাংলা'কে প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান এবং 'নিউক্লিয়াস'-'বি.এল.এফ.' এর প্রচণ্ড চাপ ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে 'জয়বাংলা' স্লোগানকে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই 'জয়বাংলা' স্লোগানই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার প্রধান সহায়ক হয়। তবে জেলা ও মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায়ে আওয়ামী লীগ-এর দু-একজন 'নিউক্লিয়াস'কে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। অন্যান্য দলেরও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে 'নিউক্লিয়াস' নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং স্বাধীনতার বিষয়টি সমর্থন করতেন।

কাজী আরেফ আহমেদ আজ বেঁচে নেই। আবদুর রাজ্জাকও চলে গেছেন। আমরা তিনজন সর্ববিষয়ে একমত পোষণ করতাম এবং একই পথে হাঁটতাম। '৬২ থেকে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের মত-পার্থক্য হয়নি। কাজী আরেফ আহমেদ 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' শীর্ষক বইটিতে যা লিখেছেন তা আবদুর রাজ্জাকেরও কথা, আমারও কথা। তাই, এ বইয়ের মূল লেখক কাজী আরেফ আহমেদকে সামনে রেখেই আমরা দু'জন এ পর্যায়ে তার সহযোগী হিসেবে থাকবো।

সিরাজুল আলম খান
জুলাই, ২০১৪



প্রকাশকের কথা

'৭১ এ আমাদের স্বাধীনতার লড়াইটা দেখেছি একজন কিশোরের চোখ দিয়ে। অংশও নিয়েছিলাম। তবে অতৃপ্তি নিয়ে। কারণ অল্প বয়স এবং মা-বাবার নিয়ন্ত্রণ তখন আমার ইচ্ছেটাকে দাবিয়ে রাখে। সে অতৃপ্তি নিয়েই স্বাধীন দেশে বড় হতে থাকি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার চিন্তা ও মননের দুয়ার খুলে যায়। অবাক বিস্ময়ে ভাবি, অল্প কয়েকজন তরুণ স্রোতের বিপক্ষে গিয়ে একটি দেশের স্বাধীনতার মতো এতো বিশাল বড় একটা কাজ কী করে সম্পন্ন করলেন! তারপর আরো বিস্ময় নিয়ে ক্রমেই টের পেতে থাকি, যাঁরা এই ইতিহাসের স্রষ্টা তাঁরা যেনো ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছেন। যাদের অবস্থান স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারায়, যাঁরা 'মহানায়কে'র দায়িত্ব পালন করে ইতিহাস গড়লেন, তাঁদেরকে পাশ কাটিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে অর্থ-সম্পদ আহরণের দিকেই বেশি মনোযোগী হলো। এ দুষ্কর্ম করতে গিয়ে তারা এমন এক কৌশল অবলম্বন করলো, যাতে তাদেরকে স্বাধীনতা-বিরোধী বলা যাবে না, আবার কাগজে কলমে স্বাধীনতাটাকে রেখে ইতিহাসটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং বিকৃত করলো।

বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস খুঁজতে গেলে গত দু'আড়াইশো বছরের বহু বিপ্লবাত্মক ঘটনা এসে যায়। সে সব ঘটনার 'নায়ক'রা তৎকালীন অবস্থায় অনেক বড় বড় মাপের কাজ করেছেন। কিন্তু উপনিবেশবাদীরা তা দেশবাসীর কাছ থেকে আড়াল করে রাখতো। এখনো তেমনিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য 'নায়ক'দের অবদানের সঠিক ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা তাদেরকে 'প্রায়' ভুলে যাওয়ার পথেই ছিলাম। কিন্তু বাধ সাধলেন গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ.' স্রষ্টা সেই তিন মহানায়ক। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি ('নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ.') সম্পর্কে বলা ও

লেখার মধ্যদিয়ে সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে তাঁদের স্মৃতিকথা ও লেখালেখিকে প্রথমে 'ক্ষুদ্র' কিছু একটা বলে মনে হতো। কিন্তু (শহীদ) কাজী আরেফ আহমেদ-এর লেখা 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' বইয়ের পাণ্ডুলিপি এবং সিরাজুল আলম খান-এর ছোট আকারে 'কথা ছিলো...' মন্তব্যটি পড়ে আমি বিস্ময়ে অবাক হই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা এ পর্যন্ত 'মিথ্যা ও বিকৃতি'র আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তথাকথিত ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন তাদের মাথায় বাজ পড়বে। 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' ও 'বি.এল.এফ.' বা 'মুজিব বাহিনী'র কার্যক্রমই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির 'মূলধারা'। এ সত্যকে যথাযথ মুল্যায়ন না করে উপায় নেই। আমি নিশ্চিত যে, সিরাজুল আলম খান যখন তাঁর 'রাজনৈতিক ইতিহাস' লিখবেন তখন আরো অনেক না বলা কথা বেরিয়ে আসবে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কাজী আরেফ আহমেদের লেখাগুলো পূর্ণাঙ্গ বই রূপে প্রকাশ করা অসম্ভব হতো যদি আই.এইচ.এন. (IHN) এর পরিচালক, স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অব.) এগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে বাধামুক্ত করে সংকলিত ও সম্পাদিত না করতেন।

সাধারণ অর্থে আমি প্রকাশক নই। তবে সিরাজুল আলম খান এর লেখা এবং বাংলার আদি মানুষদের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখা প্রকাশনার কাজটি আমি স্বেচ্ছায় করে থাকি। ভবিষ্যতেও করবো। স্বাধীন দেশের জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক তথ্য জেনে নিজেদের আগামীকে সমৃদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এই কামনা রইলো !

মো. সাখাওয়াত হোসেন
চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক (IHN)
জুলাই, ২০১৪



আমার কথা

আমাদের গৌরবের বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক বিস্ময়কর ঘটনা; নিরস্ত্র বাঙালির জীবনপণ লড়াই। কেউ তাকে রুখতে পারেনি। যাঁরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করেছিলেন, আমি সেই সব আত্মত্যাগী মানুষদের প্রণতি জানাই।

কাজী আরেফ আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি জীবনের সবকিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশ ও জনগণের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হতে পেরেছিলেন। শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রতিটি দিন ব্যয় করেছেন। যুদ্ধে পরাজিত শক্তির মানবতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নিজের দল জাসদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী সকল দলের প্রতি তাঁর একটাই বক্তব্য ছিলো, 'যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমরা জাতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবো। তাই অন্য সকল কাজের চেয়ে এ কাজকেই প্রাধান্য দিতে হবে বেশি। তরুণ সমাজ ও নতুন প্রজন্মকে দিয়ে যেতে হবে নিষ্কন্টক, উন্নত ও সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ'।

তিনি জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠন করেছিলেন গণ-আদালত। অনেক বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এক মহাসমাবেশ। তখন আমি দেখেছিলাম তাঁর দৃঢ়তা এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি। সে সময় অনেক বৈঠক হতো আমাদের টিকাটুলির বাসায়।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই কাজী আরেফ আহমেদের সাথে আমার পরিচয় ও সেই সূত্রেই তাঁর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আমাদের দু'টি সন্তান; একটি মেয়ে ও একটি ছেলে।

কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে

কালীদাশপুর বাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে চারজন সঙ্গীসহ শহীদ হন। তাঁরা সবাই জাসদ নেতা ছিলেন। সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় ঘটে এই নির্মম ঘটনা। এ ঘটনার পর আমাকে অনেক কঠিন পথ হাঁটতে হয়েছে। অনেক জটিল এবং দুর্গম পরিস্থিতি ভেদ করতে হয়েছে। নিকট পরিবেশ ও সামাজিকক্ষেত্রে পেয়েছি অনেক অসহযোগিতা। আবার অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা।

কাজী আরেফ আহমেদ চিরতরে চলে যাওয়ার পর তাঁর বাংলাদেশ নিয়ে আন্দোলন ও সংগ্রামের উপর লেখা বইটি ছাপার জন্য উদ্যোগ নিই। দু'বছর পর কাজটি করতে গিয়ে দেখি কাগজপত্র ভীষণরকম এলোমেলো ও অগোছালো হয়ে রয়েছে। সাংবাদিক শহীদকে (বর্তমানে নিউ এজ পত্রিকায়) ডেকে ধারাবাহিকভাবে পড়ে পড়ে লেখাটা একটা জায়গায় দাঁড় করালাম। তারপর 'পড়ুয়া' প্রকাশনীর সাথে আমার এ বিষয় নিয়ে কথা হয়। তারা খুব আগ্রহের সাথে ছাপাতে রাজি হয়। 'পড়ুয়া'র কর্মী কাজলকে ডেকে নিয়ে আমরা ভাগে ভাগে কম্পিউটার কম্পোজ করতে লাগলাম। এ সময় যুদ্ধকালীন বিষয়ের বেশ কিছু কাগজ খুঁজে না পেয়ে অনেকটা অসমাপ্ত রেখেই শেষ করতে হলো। এরপর আমি ফোনে ওদের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। হঠাৎ একদিন ওরা আমার ফোন ধরা বন্ধ করে দিলো। ফিরতি ফোনও নেই। আজিজ সুপার মার্কেটের 'পড়ুয়া' দোকানটিতে বারবার লোক পাঠিয়েও তাকে পাওয়া গেলো না। এরপর আমি নিজে গেলাম। সেখানে একজন বই বিক্রেতা বসেছিলেন। তিনি তেমন কিছু বলতে পারলেন না। আমি সেখান থেকে দু'টো বই কিনলাম এবং কাজল যেনো আমার সাথে অবশ্যই দেখা করে সেকথা বলে এলাম। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই 'পড়ুয়া' দোকানটি উঠে গেলো। আমি আজো তাদের খুঁজে পাইনি। পাণ্ডুলিপিটাও ফিরে পাইনি।

আমি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ি তখন। এদিকে নানাজন নানাভাবে আমাকে বইটির কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে। আমি তাদের উত্তর দিতে পারিনি। প্রচণ্ড মানসিক চাপ এবং বিড়ম্বনার মধ্যদিয়ে চলছিলাম। টিকাটুলিতে আমার ঘরে তিনবার হামলা হয়েছে। ঘরের সব জিনিসপত্র, বই-খাতা, আসবাবপত্র তছনছ হয়েছে। যাহোক, যা আছে তাই নিয়েই বইটি আবার বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছাত্রলীগ ও 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রাক্তন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা এবং আমাদের পারিবারিক শুভানুধ্যায়ী স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত) এগিয়ে এলেন সংকলন

ও সম্পাদনার কাজে। নতুন উদ্যমে প্রারম্ভিক লেখাগুলো ধরেই কাজ শুরু করি। অনেক তথ্য বাদ পড়েছে হয়তো কারণ যাদেরকে বিশ্বাস করে প্রথমে লেখাগুলো দিয়েছিলাম তারা যে আশাহত করবে ভাবতেই পারিনি।

কাজী আরেফ আহমেদের জীবনে ছিলো এক কঠিন পথ চলা। সেই বন্ধুর পথের সঙ্গী হতে পেরে আমি আজো আনন্দ অনুভব করি। কঠিন বাস্তবকে চেনার বিরল সুযোগ পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা লেখেন আমি তাঁদের লেখা আগ্রহভরে পড়ার চেষ্টা করি। ১৯৬৯ সালের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সংগঠক হিসেবে একটা কথা মনের ভেতর থেকে বারবার বেরিয়ে আসতে চায়। স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে চিরকালীন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম রবসহ আরো অনেকের। তাঁদের সাথে আরো একটি নামের কথা স্মরণ করতে চাই যিনি সেই ঝঞ্ঝামুখর সময়ে ত্যাগের মহিমা নিয়ে ঘরে থেকেও সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন; তিনি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। কাজী আরেফও তাঁর ভূমিকার কথা বইতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 'নিউক্লিয়াস', 'বি.এল.এফ' ও 'ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ'-এর ভূমিকাকে আজ অনেকে এড়িয়ে যেয়ে কল্প-কাহিনী দিয়ে গল্প বলার মতো করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিত্রিত করে থাকেন। এর ফলে নতুন প্রজন্ম অনেক মিথ্যাকে 'সত্য' বলে ধরে নিয়েছে। এই সব মিথ্যাবাদীদের হাত থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য কাজী আরেফ'র বইটি অনন্য ভূমিকা রাখবে।

আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে যা অনুভব করেছি সেগুলো বলার চেষ্টা করেছি। আশা করি সবাই ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

রওশন জাহান সাথী
সাবেক সংসদ সদস্য, / জুলাই ২০১৪



সম্পাদকের কথা

সময়টা সম্ভবত ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছি। ঢাকায় এসে বরাবরের মতো কাজী আরেফ আহমেদের অভয় দাস লেনের বাসায় সস্ত্রীক দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই তাঁর অনুসন্ধানী চোখ দু'টো আশায় ভরে উঠলো যেনো। অসুস্থ ছিলেন; গায়ে জ্বর ও সর্দি। এ নিয়েই লেখায় ব্যস্ত। ইয়া বড় এক নোট খাতা। কাছে ডেকে বললেন, 'তোমার কথা ভাবছিলাম। প্রায় শেষ করেছি। লেখাটা একটু দেখে দেবা?'

বললাম, 'শেষ করেন, আমিও ঢাকায় এসেছি। বাশার ঘাঁটিতে পোস্টিং। অবশ্যই দেখে দেবো।' দেখলাম পাণ্ডুলিপির অর্ধেক তাঁর নিজ হাতে লেখা, বাকি অর্ধেক টাইপ করা। ভালো একটা কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবো বলে মনে মনে খুশি হলাম।

সেদিন চলে আসার পরে আর খোঁজ নেইনি। ঢাকায় এসে নিজের কর্মস্থল, পেশা, বাসা পাওয়া, ছেলের ভর্তি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে দুঃসংবাদ পেলাম তিনি কুষ্টিয়ার এক জনসভায় নিহত হয়েছেন।

এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পেতে ব্যর্থ চেষ্টা করি। অবশেষে সাথী আপা (কাজী আরেফের স্ত্রী) জোগাড় করে আমার হাতে যা তুলে দিলেন, তা একেবারেই তাঁর প্রথম দিকের লেখা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কতগুলো পাতা। সুন্দর বাঁধাই করা খাতা এবং টাইপ করা লেখাগুলো আর পেলাম না। তাঁর মৃত্যুর পর বাসা একাধিকবার লুটপাট ও তছনছ হয়। কাজেই আমার নিজ চোখে দেখা পাণ্ডুলিপিটি পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে যা পেয়েছি তা-ই টাইপ করে সাজিয়েছি।

বইটির মূল বক্তব্য, তাঁরই ভাষায়, 'আমরা আমাদের রুটস বা মূল শেকড়

খুঁজবো না, এমন দৈন্যে ভোগার কোনো কারণ নেই। ...'

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতির প্রাচীন পরিচিতি আছে। পাঁচ হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আর প্রায় দু'হাজার বছরের রাষ্ট্রীয়-রাজনীতি ও বাঙালি জাতিত্ববোধের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। পাল বংশের পর থেকে সেন, সুলতান ও নবাবী আমলে প্রায় এক হাজার বছর বাংলাদেশ 'বিদেশি অভিজাত'দের দ্বারা শাসিত ছিলো। অত:পর মোঘল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা ৪১৫ বছর বাংলায় উপনিবেশ কায়েম করে। এই পরাধীনতা ও শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ বারবার বিদ্রোহ করে। তারই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৭১এ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কারো একক কৃতিত্বে নয়, বরং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ত্যাগের সুফলই আমাদের মহান স্বাধীনতা।

আজ বিশ্ব মানব সভ্যতার পাশাপাশি আমরাও একুশ শতকে এসে উপনীত হয়েছি। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি যুদ্ধ ছেড়ে, শান্তির শ্বেত কপোত হাতে আগামীকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। আমরাও রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক জটিলতাকে ভর করেই গণতন্ত্র ও আরো 'উন্নত গণতন্ত্র'র যাত্রাপথে একুশ শতকের নতুন পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চাই। বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রতি আমরাও আস্থাশীল এবং অনুপ্রাণিত। আমরাও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়িয়ে নতুন মানব বন্ধন রচনা করে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এক অভিন্ন মানবসত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এভাবে বর্তমানকে, অতীতের সাথে সংযুক্ত করেই আমরা আমাদের 'জাতীয় রাষ্ট্র' বাংলাদেশ এবং বাঙালি সভ্যতার ভবিষ্যৎ গড়বো।

সমাজ বিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের তীব্রতার পটভূমিতেই আমাদের সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হতে হবে।

বইটির শিরোনাম ও প্রচ্ছদ তিনি নিজে যা ঠিক করে গেছেন, তাই আমি বাস্তবায়ন করেছি। এর সঙ্গে সম্ভবত: 'শশাঙ্ক থেকে শেখ মুজিব' শীর্ষক একটি ফটো এ্যালবাম জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটা আমি পারিনি। এছাড়া একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পাদনায় কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেলো। এ অপারগতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এলোমেলো পৃষ্ঠাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাতে আমার সময় ও ধৈর্য দু'টোই যথেষ্ট লেগেছে। কতোখানি সফল হয়েছি পাঠক বিবেচনা করবেন।

তনিমা কম্পিউটার কম্পোজ করেছে অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তা পোষানো যাবে না। তার জন্য রইলো আমার অনেক আদর। একই কথা হুমায়ুনের বেলায়ও প্রযোজ্য। আরেফ ভাইয়ের আঁকা নক্সানুসারেই সে প্রচ্ছদ তৈরি করেছে, তবে ছবির সংখ্যা সঙ্গতকারণেই কমাতে হয়েছে। টুটুলের নিরব নি:স্বার্থ আর্থিক সহায়তা না পেলে এসব কিছুই করা যেতো না। তার প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এই বইয়ের উপর মন্তব্য করার ধৃষ্টতা দেখাবো না। তবে বাঙালি জাতির এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সরল রেখার মতো সুন্দর একটি চিত্র এঁকে গেছেন। পুরো পাণ্ডুলিপিতে হয়তো আরো বিস্তর কিছু ছিলো, আমি খণ্ডিত পাতাগুলো সংকলিত করতে গিয়ে তা টের পেয়েছি।

পরিশেষে, অদৃশ্যলোকে ঠাঁই নেয়া শ্রদ্ধাভাজনেষু আরেফ ভাইকে জানাতে চাই, আপনার লেখাটা আমি 'দেখে দেবা'র চেষ্টা করেছি। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন।

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত)
জুলাই, ২০১৪

লেখকের কথা



১৯৪৭ থেকে '৭১ সালের মধ্যে বাঙালির জাতীয় জীবনে দু'টো বড় রকমের ঘটনা ঘটেছে, যা বাঙালির ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছে। একটি ভাষা আন্দোলন, অপরটি '৭১ এর সশস্ত্র যুদ্ধ। আত্মসম্মানে আঘাত প্রাপ্ত বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ ছিলো ভাষা আন্দোলন। আর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রামের শেষ পর্ব সশস্ত্র লড়াই। এ দু'টিতে সংগঠিত শক্তি ছিলো ছাত্র-যুব সমাজ আর সৈনিকের ভূমিকায় ছিলো জনগণ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার ছিলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। 'জয়বাংলা' ছিলো আমাদের অনুপ্রেরণা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। আমাদের লক্ষ্য ছিলো, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আর অগণতান্ত্রিক, অবৈধ সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে গুড়িয়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু বাঙালি স্বনামধন্য ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে মানুষদের নামের তালিকা দীর্ঘ। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ভাগের আন্দোলন ও সশস্ত্র লড়াইয়ে সেসব নেতাদের ভূমিকাই নিয়ামক ছিলো। আর সমগ্র আন্দোলন ও সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর 'নামে'ই।

আমাদের সময়কালে আমরা এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় বীর বা বীরশ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে কৃপণতা দেখাচ্ছি বটে। কিন্তু সে জন্য আগামী প্রজন্মের চোখে শহীদরা ছোট হবেন না, ছোট হবো আমরা।

১৯৫৮ সালে অবস্থিত গণতন্ত্রকে হত্যার মধ্য দিয়ে আইয়ুবী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হয়। জংলি শাসনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার নবতর কৌশল উদ্ভাবিত হয়। '৬২ সালে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে গণবিস্ফোরণে রূপান্তর ঘটায়। আইয়ুবের শিক্ষা সংকোচন নীতির (শরিফ কমিশন) বিরুদ্ধে '৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাতিকে আস্থাশীল হতে সাহায্য করে। আর '৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা পেশ এবং এর ভিত্তিতে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করা ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করা। '৬৯ সালের ১১ দফা ভিত্তিক গণআন্দোলন যখন

গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হলো, তখনই বাঙালি জাতি 'জয়বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা-পদ্মা মেঘনা যমুনা' স্লোগানের মধ্যদিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদ বোধকে তথাকথিত পাকিস্তানি জাতির বিকল্প হিসেবে দাঁড় করায়। আর 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা' এই স্লোগানের মধ্যদিয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির শতাব্দীর অবিস্মরণীয় ঐক্য শুরু হয়। আর এ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান (পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।

১৯৫৪ সাল থেকে এদেশের গরীব ও মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দাবি আদায়ের উপযুক্ত সংগ্রামী ঐক্য ও জনগণকে লড়াকু মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করেন মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ছত্রছায়ায় এদেশের বামপন্থী নেতা ও নেতৃত্বের অবস্থান দৃঢ় হয়েছিলো। কিন্তু সেদিনের (আন্তর্জাতিকতাবাদী) বামপন্থী নেতারা বাংলার গণমানুষের স্বত:স্ফূর্ত প্রাণের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হন। তাঁরা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে বিজয়ের মুখোমুখি নেয়ার দলিল ছয় দফা দাবিকে সি.আই.এ.-এর দলিল বলে কটাক্ষ করেন এবং '৭০ এর নির্বাচনকে বর্জন করে বাঙালির মন থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেন। আর জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিব জনগণের সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলস্রোত থেকে এই বামপন্থীরা ছিট্‌কে পড়ে।

আজ আমাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত, যাতে আমরা আগামী প্রজন্মের মানুষের হাতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস তুলে ধরতে পারি। যে জাতি তার পূর্বপুরুষের বীরত্বগাঁথা এবং ত্যাগের কথা জানে না, সে জাতির জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধ অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। সে জাতি পৃথিবীতে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাই আজ দেশের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের উচিত নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী ভূমিকা রাখা। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ের নেতা ও সংগঠকদের উচিত সেই ইতিহাস রচনায় সহযোগিতা করা। আর স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের উচিত নিজেদের কৃতিত্ব উপস্থাপনের পাশাপাশি অন্যের অবদানকে খাটো বা অস্বীকার না করে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট হওয়া।

কাজী আরেফ আহমেদ

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম



ব্রাহ্মী লিপি খ্রিস্টপূর্ব ৩-২ অব্দ

বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বাংলা এক প্রাচীন জনপদ। নানা ধর্ম-বর্ণ- লোকাচার-বিশ্বাস মিলেমিশে গড়ে উঠেছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি।

১৪০০ বছর আগে বাংলায় গুপ্ত যুগের সূচনা
১২০০ বছর আগে বাংলায় বৌদ্ধ রাজত্ব পাল যুগের সূচনা
১০০০ বছর আগে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব সেন যুগের সূচনা
৮০০ বছর আগে বাংলায় মুসলিম সুলতানি শাসনের সূচনা
৪৫০ বছর আগে বাংলায় মোগল শাসনের সূচনা
১৮৫৭ সাল থেকে বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় পূর্ব-বাংলা
১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে



আরবি লিপি ১৪১৫-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলা ও বিহার

বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

অনেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে বলে থাকেন যে ১৯৪৭ সালের আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদী অস্তিত্ব না খুঁজতে অথবা '৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। এই অর্বাচীন যুক্তি হলো– কোনো হতাশাগ্রস্ত মানুষ যদি তার নিজের হীনমন্যতার কারণে নিজের 'রুটস' খুঁজে না পান তবে তার জন্যে অন্যকে 'রুটস' খুঁজতে বারণ করা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষেরাও তাদের 'রুটস' খুঁজতে ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি ইউরোপের স্পেনে গিয়ে যে হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির শিহরণ অনুভব করেছিলেন সেকথা স্বীকার করতে এতোটুকু দ্বিধা করেননি। আমরা আমাদের রুটস বা মূল শেকড় খুঁজবো না, এমন দৈন্যে ভোগার কোনো কারণ নেই।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতিত্ব গঠনের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরিচিতি আছে। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও রাঢ় নামের রাজ্যগুলো কখনো পৃথক রাজ্য আবার কখনো ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে ছিলো। পাঁচ হাজার বছরের বাঙালির নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আর দু'হাজার বছরের বাঙালির রাষ্ট্রীয়-রাজনীতি ও জাতিত্ববোধের স্পষ্ট ইঙ্গিত

পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পুঁথিতে যে পুণ্ড্র নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিলো বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতকে বঙ্গ কৌম (Tribe) এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় আর্য ও জৈনদের ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, বোধায়ন ও আচারঙ্গ সূত্র ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে। বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মা-ব্রক্ষপুত্র-যমুনা আর মেঘনার পানি প্রবাহিত অঞ্চল মিলে 'বঙ্গকৌম' পরে বঙ্গজনপদ ও গঙ্গা রাষ্ট্র এবং তারপর 'বঙ্গ রাষ্ট্র' গড়ে ওঠে।

মহাভারতেও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে এবং বঙ্গ জনপদের রাষ্ট্রসত্তা ও সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাবীর রঘুর বিরুদ্ধে বঙ্গের নৌবাহিনীর যুদ্ধের ইতিহাস রঘু বংশের ৪র্থ সর্গে আছে। রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডের ১০ম সর্গে দেখা যায়, রামের অভিষেক বার্তা শুনে বিষণ্ন কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাজা দশরথ বলেছিলেন, বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ ও কৌশল প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কৈকেয়ীর যা পছন্দ তাই তিনি এনে দেবেন। সেকালের বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। চৌদ্দশত বছর আগে সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গের স্বাধীন নরপতি ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এর বিপরীতে অনেকে মনে করেন ভদ্র বংশ সপ্তম শতকে বঙ্গকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

সমসাময়িক সময়ে গঙ্গা নদীর উত্তরে পুণ্ড্র জনপদে সম্রাট শশাঙ্ক গৌড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজারা ৪ শত বছর গৌড় রাষ্ট্রে রাজত্ব করেছিলো ৭৫০ সাল থেকে ১১৬০ সাল পর্যন্ত। আর সেন রাজাদের ১০৯৫ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত সময়ে গৌড় বঙ্গকে রাজতন্ত্রের অধীনস্থ করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলসমূহকে শাসন করেন। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দু'শত বছর 'স্বাধীন' সুলতানী আমল বাংলাকে দিল্লীর বিরুদ্ধে 'স্বাতন্ত্র্য' বজায় রাখতে সক্ষম হয়। আর দু'শত বছরের মোঘল আমলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ১৫৩৯ থেকে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। সতেরো বছরের নবাবী আমল (১৭৪০-১৭৫৭), ১৯০ বছরের ব্রিটিশ (১৭৫৭-১৯৪৭) ও ২৪ বছরের পাকিস্তানি ('৪৭-'৭১) ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নির্যাতনে দিশেহারা বাংলার জনগণের বার বার বিদ্রোহ করার ইতিহাস আছে।

সুদীর্ঘ ২১৪ বছরের উপর্যুপরি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও নির্যাতনে দিশেহারা বাংলার মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, সংগ্রাম, বিদ্রোহ, সর্বশেষ সশস্ত্র সংগ্রাম-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুসলিম

বস্ত্র শিল্পের তাঁতীদের ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, চাকমা-সাঁওতাল-চোয়াড়-খাসিয়া বিদ্রোহ, তিতুমীরের সশস্ত্র লড়াই, মজনু শাহ, ভবানী পাঠকের বিদ্রোহ ছিলো এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দিকের গৌরবজ্জ্বল ঘটনা। প্রবাসে রাসবিহারী বসু, সুভাষ বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'র সশস্ত্র যুদ্ধের ইতিহাস, সর্বভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ প্রতিষ্ঠা'র আন্দোলন, অগ্নিযুগের 'অনুশীলন' সমিতি ও 'যুগান্তর'-এর সশস্ত্র কার্যকলাপ ও ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন আর প্রীতিলতার সশস্ত্র সংগ্রামী ইতিহাস উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য এদেশীয় ব্রিটিশ সমর্থক ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। এ লক্ষ্যে তারা 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তন করে। এর ফলে ধনী ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কোম্পানি এ দেশীয় ভূ-স্বামী শ্রেণির সাহায্যে এদেশে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে। এরা জনগণের উপর প্রচণ্ড প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। পরবর্তীতে এ জমিদাররাই জনগণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ করে ধনকুবে পরিণত হয়।

পরবর্তীতে ব্রিটিশের সৃষ্ট এক নতুন মধ্য শ্রেণি এবং নতুন প্রজন্ম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিকশিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কল-কারখানা পরিচালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসকরা নিজ স্বার্থে এদের কাজে লাগানোর জন্য ১৮৮৫ সালে ভারতীয় 'জাতীয় কংগ্রেস'র জন্ম দেয়। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিলো ব্রিটিশের সহযোগিতা এবং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা। কংগ্রেস যখন আপোসমুখীনতা ছেড়ে জাতীয় স্বার্থে আন্দোলনের পথে পা বাড়ালো, তখন ব্রিটিশ তার 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির (divide and rule policy) পথ ধরে মুসলমানদের কাজে লাগায়।

১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করে। 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সহায়তায় মুসলিম ধনী ভূ-স্বামীরা ১৯০৬ সালে ডিসেম্বরে ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম দেয়। জন্মলগ্নে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিলো রাজভক্তি অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিমদের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা। ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হলে মুসলিম সমাজ ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

কংগ্রেসের আপোষমুখী চরিত্র দেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সহযোগী শ্রেণির পরবর্তী প্রজন্মের তরুণদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'স্বরাজ' ও 'স্বদেশি' আন্দোলন। তৎকালীন সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ এদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। দেশবরেণ্য বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাদের অন্যতম। এছাড়াও প্রমথ মিত্র, রাস বিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্র ঘোষ, বিপিন পাল, হেমচন্দ্র দাশ, বালগঙ্গধর তিলক, পুলিন বিহারী দাশ ও সাভারকর (গণেশ দামোদর ও বিনায়ক দামোদর) ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ।

১৯০২ সালে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ঢাকায় 'অনুশীলন' সমিতি গঠন করেন। রবীন্দ্র ঘোষ কোলকাতায় ১৯০৩ সালে অনুশীলন সমিতির শাখা এবং ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' নামে আরেকটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রজাপতি সিংহের 'প্রবাসী সরকার' গঠন এবং ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ দল' গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এবং প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তারপর ১৯২৪ (মতান্তরে ১৯২৮/১৯৪২) সালে রাস বিহারী বসুর 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ', '৪২ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (INA) গঠন ও প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠা, '৪২ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রবাসী সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ইতিহাস, সর্বভারতীয় অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ ভারত আন্দোলন ও বিপ্লবী সূর্যসেনের নেতৃত্বে '৩০ সালে ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি গঠন, চট্টগ্রাম থেকে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং অগ্নিযুগের ক্ষুদিরাম, বাঘা যতিন, প্রীতিলতা ও মাতঙ্গীনি হাজরার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপনই ছিলো বাংলার স্বাধীনতার চূড়ান্ত ইঙ্গিত। 'লাহোর প্রস্তাবে' উত্থাপিত ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐক্য ও ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহে একাধিক রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকলেও সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও অটুট রাখার স্পষ্ট উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু '৪৬ সালে দিল্লি কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবে 'রাষ্ট্রসমূহ' সংশোধন করে 'একক

রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'র ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হয়। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বে চক্রান্তের বেড়াজালে 'লাহোর প্রস্তাব' আটকা পড়ে। 'একাধিক রাষ্ট্র'র জায়গায় 'একক' রাষ্ট্রের সংশোধনী এনে '৪৭ সালে পাকিস্তান নামক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটির জন্ম দেয়। মিস্টার জিন্নাহর 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'র ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সাথে সাথে বাংলাকেও ভাগ করা হয়। বাংলার পশ্চিমাংশকে ভারতের সাথে যুক্ত ও পূর্বাঞ্চলকে পাকিস্তানের অংশ করা হয়।

বাংলাদেশ পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। বাঙালি প্রভু বদলালো, স্বাধীনতা পেলো না। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে তাদের শোষণ ও লুন্ঠনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের আন্দোলন, সংগ্রাম ও সংঘর্ষ নিত্যদিনের কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ালো। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ছিলো পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানি শাসকরা '৪৭ সালের মধ্য আগস্ট থেকে বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, লুটেরা আমলা, প্রশাসনযন্ত্র, নিপীড়নের হাতিয়ার ব্যারাক আর্মি এবং শাসকের প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগ রেখেই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলো।

জন্ম মুহূর্ত থেকে ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ২৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় বাঙালি ও বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রতিনিয়তই হামলা চলেছে। আর রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনাই ছিলো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিলো কিছু সংখ্যক ঠগ, ভণ্ড ও ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী মহলের খপ্পরে। এই চক্রটি ছিলো নিম্নস্তরের আমলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সামন্ত জমিদারদের রাজনীতিতে এনে আমলা ও সামন্তদের একটি মিশ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। গোলাম মোহম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, আই.আই. চুন্দ্রীগড় ও ফিরোজ খান ছিলেন বড় ঘরের আমলা। আর লিয়াকত আলী খাঁন, খাজা নাজিমুদ্দিন, মমতাজ দৌলতানা, এ কে ব্রোহী ও ভূট্টো ছিলেন সামন্ত বা জমিদার। মিস্টার জিন্নাহ ও ডাঃ খান ছাড়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক চক্রে আর কোনো রাজনীতিক জায়গা পাননি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি রাষ্ট্র যন্ত্রটি ছিলো শোষণ, বৈষম্য ও লুটপাটের 'গবেষণাগার'। পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার আবির্ভাব মুহূর্তে আরব সাগর থেকে উদ্ধার করা 'কয়েক মণ স্বর্ণ'র তাল রাতারাতি পিতল হয়ে যাওয়ার অদ্ভুত

ঘটনাই ছিলো পাকিস্তানি অর্থনীতির মৌলিক চরিত্র। পরে আবিষ্কার হয় কুখ্যাত স্বর্ণ চোরাচালানি কাসেম ভাট্টি ও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার স্ত্রী নাহিদ মীর্জা একই ব্যবসার অংশীদার। পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকরা সব সময়ই বাঙালি ও বাংলাভাষাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। তাই পাকিস্তানের জন্ম মুহূর্ত থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শুরু করে।

প্রস্তুতি পর্ব

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে পূর্ব বাংলায় শাসক ও শোষকের বদল হলো কিন্তু বাংলা প্রকৃত স্বাধীন হলো না। বাঙালির প্রভু বদলালো; বাঙালি স্বাধীন হলো না। ইংরেজদের বদলে পাঞ্জাবীরা হলো পূর্ব বাংলার শাসক। ব্রিটিশ তার ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ছাড়লো। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া দীর্ঘকালের ভেদনীতি সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধ্বংসের নীল নকশা নিয়ে পাকিস্তানি শাসকবর্গ '৪৭ এর মধ্য আগষ্ট থেকে বাংলাকে শাসন ও শোষণ করতে শুরু করলো। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তই ছিলো পাকিস্তানি শাসকদের বৈশিষ্ট্য। আর তাদের শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংগ্রাম-সংঘর্ষ নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হলো। তার ধারাবাহিক চিত্র সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

ভাষা আন্দোলন

সর্বপ্রথম আঘাত আসে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর। শুরু হয় সিন্ধি, পাঞ্জাবী (পশ্চিম পাঞ্জাব), পাঠান, বেলুচী আর বাঙালি (পূর্ব বাংলা) জাতিসমূহের সংমিশ্রণে এক নতুন সাম্প্রদায়িক জাতি সৃষ্টির অলিক স্বপ্ন। সৃষ্টি করা হয় ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'পাকিস্তানি জাতি'। আর পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামে ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে সৌদি আরবসহ



১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পূর্বে আমতলায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশ



শহীদ আবুল বরকত



শহীদ আবদুল জব্বার



শহীদ রফিক উদ্দিন



শহীদ শফিউর



২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের স্থির চিত্র

মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ফার্সি ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মিশ্রিত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণপরিষদ সদস্য বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তিনি উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার সুপারিশ করেন। দত্ত বাবুর এই দাবির বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবিকে, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পাকিস্তানকে দ্বিধাবিভক্ত করার চক্রান্ত' বলে আখ্যায়িত করেন। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান থেকে 'গণপরিষদ' সদস্যের ৫৬% শতাংশ সদস্যের মধ্যে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাবকে মাত্র একজন সদস্য, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা নয়। পাকিস্তানের উপর তলার কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ভাষা।' তাই তিনি বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এছাড়া সেদিন বাংলার অন্য কোনো গণপরিষদ সদস্যই বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলার বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম' কমিটি গঠন করে এবং শামসুল আলমকে (ফজলুল হক হল সংসদের সহ-সভাপতি) আহ্বায়ক করে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

কমিটি ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' পালন করে। ঐদিন ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষে ২০০ আহত ও ৯০০ জন গ্রেফতার হয়। এর মধ্যে ৬৯ জনকে জেলে পাঠানো হয়। পুলিশ আহত অবস্থায় ছাত্রলীগের সংগ্রামী নেতা অলি আহাদ, শওকত আলী, আজিজ আহমেদ, বায়তুল্লাহ, দবিরুল ইসলাম, খালেক নেওয়াজ খান, শেখ মুজিব, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখকে গ্রেফতার করে। এ সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহর ঢাকায় আসার কর্মসূচি থাকায় পূর্ব বাংলাকে শান্ত রাখার জন্য পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে (বর্ধমান হাউজ, বর্তমানে বাংলা একাডেমীর মূল ভবন) ১৫ মার্চ '৪৮ সালে এক বৈঠকে ছাত্র ও সরকারের মধ্যে ৮ দফা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন আহমেদ এবং সরকার পক্ষ থেকে স্বয়ং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন স্বাক্ষর করেন।

ছাত্র সমাজ খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি '৫২ সালে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামীলীগ), অলি আহাদ, আবুল হাসেম (সভাপতি, খেলাফাতে রব্বানি পার্টি), আবুল কাসেম (সাধারণ সম্পাদক, তমুদ্দুন মজলিশ), আবদুল গফুর (সাপ্তাহিক সৈনিক), কামরুদ্দিন আহমেদ, মো. তোয়াহা, শামসুল হক চৌধুরী (ছাত্রলীগ অপর গ্রুপ), খালেক নেওয়াজ (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ), খয়রাত হোসেন (গণপরিষদ সদস্য), মীর্জা গোলাম হাফিজ, শামসুল আলম, আনোয়ারুল হক, গোলাম মওলা (সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সংসদ), শওকত আলী (কর্মী শিবির), এস এ বারি এটি, সৈয়দ কামরুদ্দিন হোসেন শাহুদ, আবদুল মতিন (বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ) ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা 'কর্মী পরিষদ' গঠিত হয়। 'কর্মী পরিষদ' ভাষা আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচি পালন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সে সময় ভাষা আন্দোলনের একমাত্র প্রচার বাহন দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকাটির উপর সরকার ১৩ ফেব্রুয়ারি ('৫২) নিষেধাজ্ঞা জারি করে বন্ধ করে দেয়। '৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঢাকা বেতার থেকে ১৪৪ ধারা জারির সংবাদ পরিবেশন করা হয়। ওই সন্ধ্যায় ৯৪নং নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে খেলাফাতে রব্বানি পার্টির জনাব আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় 'কর্মী পরিষদ'র বৈঠক বসে। বৈঠকে পরিষদ সদস্যবৃন্দ ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দেন। কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে থাকায় মোহাম্মদ তোয়াহা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও ভোট দেয়ার সময় পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেন।

রাষ্ট্রভাষা 'কর্মী পরিষদ'র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্তের ফলে শত শত ছাত্র-ছাত্রী, যুবকর্মী, রাজনৈতিক সংগঠক ও সংস্কৃতিক কর্মীরা ভাষা আন্দোলনকে একটা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলো তা বিফলে যাবার উপক্রম হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা রাত ১২ টার সময় ঢাকা হলের পুকুর পাড়ে বিকল্প সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বসেন। এদের মধ্যে ছিলেন গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের প্রধান), মো: সুলতান, এম আর আখতার মুকুল, আবদুল মমিন, এস এ বারি এটি, সৈয়দ কামরুদ্দিন হোসেন শাহুদ, আনোয়ারুল হক খান ও মঞ্জুর হোসেন (মেডিক্যাল কলেজ) সিদ্ধান্ত নেন 'কর্মী পরিষদ' সিদ্ধান্ত না মেনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সিদ্ধান্ত হয় গাজীউল হক ২১ ফেব্রুয়ারির আমতলার মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করবেন এবং যদি তিনি গ্রেফতার হয়ে যান, তাহলে কামরুদ্দিন হোসেন শাহুদ সভাপতিত্ব করবেন।

আমতলায় বেলা ১১ টায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। প্রায় ১০ হাজার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রী, যুব কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার চাপ দেয়া শুরু করেন। সভা চলাকালীন সময়ে সভাস্থলে সংবাদ পৌঁছালো যে, পুলিশবাহিনী লালবাগে স্কুল ছাত্রদের একটি মিছিলে লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। ফলে ৫ জন করে ছাত্র মিছিল বের হওয়া শুরু হলো। হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম ৫ জনের দলটি সকল বাধা অতিক্রম করে গেট পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছালো। পুলিশ এদের গ্রেফতার করে গাড়িতে তুললো। দ্বিতীয় দলটির নেতৃত্ব দিলো ইব্রাহিম তাহা। তৃতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলো আনোয়ারুল হক খান। চতুর্থ দলটি ছিলো ছাত্রীদের; সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা ও শামসুন নাহার। পরের মিছিলটির নেতৃত্ব দেন শাহাবুদ্দিন আহমেদ (সাবেক প্রধান বিচারপতি ও সাবেক রাষ্ট্রপতি)। মিছিলের এক ছাত্রকে পুলিশ অহেতুক লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করায় ছাত্র-পুলিশের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্র-পুলিশের এই সংঘর্ষ প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী চলে। বেলা দুটো পর্যন্ত কলাভবনে ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ চলে। পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ কলাভবন ও মেডিক্যাল কলেজের মধ্যবর্তী দেয়াল ভেঙে ফেলে। ফলে ব্যারাক, হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও হোস্টেল, কলাভবন ও পাশ্ববর্তী এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন বিকেলে গণপরিষদ ভবনে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। গণপরিষদ ভবন ছিলো জগন্নাথ হল সংলগ্ন। আইন পরিষদে যাওয়ার পথে কয়েকজন এম.এল.এ. মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ব্যারাকে এসে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করেন। ঠিক এমনি সময় পুলিশ হঠাৎ ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। একজন স্কুল ছাত্র মাথায় গুলি লাগায় মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেটি সপ্তম শ্রেণির, নাম জব্বার। হাসপাতালে আনার সাথে সাথে জব্বার মারা যায়। এরপর গুলিতে রফিক মারা যায়। পরে বরকত গুলিবিদ্ধ হয়। পরে সেও মৃত্যুবরণ করে। বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়। জব্বার,

রফিক ও বরকত শহীদ হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হাজারো মানুষের ভিড় হয়ে যায়। তখন ছাত্রদের স্লোগানে শুধু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এ সীমাবদ্ধ রইলো না। শুরু হলো, 'খুনী নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'বাংলার জারজ সন্তান নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই' ও 'মুসলিম লীগ সরকার ধ্বংস হোক নিপাত যাক'। পরিষদ ভবনে ছাত্রদের গুলি করে হত্যার খবর পৌঁছালো মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়সহ পরিষদ সদস্যরা এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন পরিষদ সদস্য মাওলানা তর্কবাগিশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন পদত্যাগ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি শহীদদের লাশ না দেয়ায় মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-জনতা গায়েবানা জানাজায় মিলিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে বৈঠকে বসে 'কর্মী পরিষদ' পুনর্গঠন করে। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অলি আহাদ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১০ টায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জানাজা ও শোক মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করে। গায়েবানা জানাজা শেষে জনতার মিছিল কলাভবন, কার্জন হল, হাইকোর্ট, ফজলুল হক হল, রেলওয়ে হাসপাতাল, রমনা রেস্ট হাউজ (গুলিস্তান সিনেমা হল সংলগ্ন) প্রভৃতি অতিক্রম করে এগুতে থাকে। হাইকোর্টের সামনে পুলিশের ট্রাক মিছিলের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে একজন মিছিলকারীকে হত্যা এবং লাঠিচার্জ ও বেয়োনেট চার্জে বেশ কয়েকজনকে আহত করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। মিছিলটি বাহাদুর শাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক) পর্যন্ত যায়। মিছিলটি রথ খোলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে শফিকুর রহমান নিহত হয়। যারা ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা হলের পুকুর পাড়ে বসে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত অমান্য করে এবং পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কাছে বাঙালি জাতি চিরঋণী থাকবে। জাতি আরো কৃতজ্ঞতার সাথে চিরদিন স্মরণ করবে যে বীরেরা পাকিস্তানি বর্বর শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিকযন্ত্র আমলা ও পুলিশের সকল বাধা ছিন্ন করে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একুশের ভাষা আন্দোলনের একটা চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা যায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলো ধনীদের হাতে। পাকিস্তানি আন্দোলনের কাণ্ডারীরা ছিলো মূলত: অবাঙালি ও ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। একুশের ভাষা


১৯৬৪ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির সমাবেশে ভাসানী, তাজউদ্দিন, শেখ মুজিব ও তর্কবাগীশ।

আন্দোলন ছিলো সে পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অনাস্থা। মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে শুধু মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে দেখা ঠিক নয়। একুশ ছিলো পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ এবং ব্রিটিশের অনুসৃত পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম বিদ্রোহ। এছাড়াও একুশ হলো বাঙালির তথাকথিত পাকিস্তানি জাতি সৃষ্টির স্বপ্নকে ভেঙ্গে দেয়ার অনুপ্রেরণা ও অহংকার।

আজ বাঙালির জাতীয় জীবনে ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি ('৫২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই দিনটি যেমন জাতীয় শোকের দিন, তেমনি জাতীয় জীবনের গৌরবদীপ্ত দিনগুলোর অন্যতম। এইদিন জাতীয় বীরেরা মায়ের ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে রক্ত দিতে পিছপা হয়নি। শহীদ সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার, রফিক ও সালাউদ্দিন শিখিয়ে গেছেন মা, মাতৃভাষা আর মাটি নিজের জীবনের চেয়েও দামী। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দিন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অবাঙালি (মুসলমান) ও হিন্দুদের দাঙ্গা

১৯৬৪ সালে ১৪ জানুয়ারি, নারায়ণগঞ্জের এক কারখানায় অবাঙালি (বিহারী) শ্রমিকরা হিন্দু শ্রমিকদের আক্রমণ করে কয়েকজনকে হতাহত করে। এমনি করে পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। '৬৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকা শহরের হিন্দুদের দোকানপাট, বস্তি ও মহল্লা বিহারীরা আক্রমণ করে। অবাঙালি, পুলিশ, ই.পি.আর ও সৈনিকদের নিষ্ক্রিয় রেখে পাকিস্তানি শাসকচক্র

বাংলাদেশে এই দাঙ্গা সংঘটিত করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি '৬৪ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বদলীয় ছাত্রদের শান্তি মিছিল বের হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে এই মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলটি নবাবপুরে ঢুকলে অবাঙালি দাঙ্গাকারীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। রথখোলার কাছে মিছিলটি দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়। ফলে মিছিলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ টিপু সুলতান রোড হয়ে রেঙ্কিন স্ট্রীটে ঢুকে পড়ে।

এর আগেই মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেবের অনুরোধে দু'টি হিন্দু পরিবারকে সিদু মিয়ার (মশিউর রহমান যাদু মিয়ার ভাই) বাড়িতে স্থানান্তরিত করে আমি সেখানেই অপেক্ষা করছিলাম। মিছিল দেখে আমরা উৎসাহিত হলাম। কিন্তু পাশেই অবাঙালি কর্তৃক মিছিলটিকে আক্রমণের প্রস্তুতি দেখে শংকিত হলাম। মিছিলের সামনে ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, সাইফুদ্দিন মানিক, নুরুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন। সেদিন গুটিকতক বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালিদের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ সমস্ত বাঙালি জাতিকে অসহায় করে তাদের কাছে জিম্মি করে ফেলেছিলো। '৬৪ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। '৪৭ এর দেশ বিভাগের সময় বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো শরণার্থী হয়ে এ বাংলায় এসে ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মুসলিম লীগের পাণ্ডা ও সরকারের হুকুমের দাসে পরিণত হয়েছিলো। এই দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক। ইসলাম ধর্মের বা হজরত মুহম্মদ (স:) এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কোন অভিপ্রায় দাঙ্গাকারীদের ছিলো না। বরং কাশ্মীর প্রীতিই ছিলো এর মূল কারণ। দাঙ্গার পর থেকে দাঙ্গাকারী বিহারীরা বাংলার মানুষের কাছে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। ছাত্র সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক একটা লিফলেট সারাদেশে বিতরণ করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি, তার নবতর আবিষ্কার 'মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি'র নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নয়টি বিরোধী দল 'কপ' (combined opposition parties- COP) গঠন করে ৯ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে

জাতীয়, প্রাদেশিক ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। মুসলিম লীগের এক অংশকে কনভেনশন মুসলিম লীগ নাম দিয়ে পুনর্গঠিত করে আইয়ুব খান তার প্রেসিডেন্ট হন এবং দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। বিরোধী দল আইয়ুবের বিরুদ্ধে মি. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মানুষ মিস জিন্নাহকে স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছিলো। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভই মিস জিন্নাহর প্রতি সমর্থনের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো এ বাংলায়। ছাত্র সমাজ বিশেষ করে ছাত্রলীগের ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজ ছেড়ে মিস জিন্নাহর নির্বাচনে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। ১৭ জুলাই ১৯৬৪-তে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪১ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। এ বিষয়টা নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলনে নামলে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। ১৮ সেপ্টেম্বর সরকার স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করলে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। ২০ সেপ্টেম্বর জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। 'কপ' ২৯ সেপ্টেম্বর হরতাল ঘোষণা করে। মোটকথা, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ছাত্র-শ্রমিক ও পেশাজীবীদের শায়েস্তা করার জন্য সরকার অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ অবলম্বন করে। ১৯ নভেম্বর মিস জিন্নাহকে ভোট দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে পূর্ব বাংলায় ৪০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মেম্বার নির্বাচিত করে। আইয়ুব খান সরকারি আমলা ও দালালদের সহায়তায় 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মেম্বারদের হাত করার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রচুর অর্থ ঢালে ও 'ওয়ার্কস প্রোগাম'-এর নামে ১০০ কোটি টাকা তাদেরকে অবাধে খরচ করার সুযোগ দেয়। বেহিসাবি এই অর্থ 'মৌলিক গণতন্ত্রী'দের ঘুষ হিসাবে দেয়া হয়। ২ জানুয়ারি '৬৫ সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্য দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করে ঐ রাতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে। আইয়ুব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পূর্ব বাংলায় আইয়ুব ভোট পান ২০,৭২০টি আর মিস জিন্নাহ ১৮,০৮০টি। পাকিস্তানের অবাঙালি অংশে আইয়ুব ভোট পান ২৮,৯২৭ টি আর মিস জিন্নাহ ১০,২৬৩টি। এই নির্বাচনে ছাত্র যুবসমাজ পাকিস্তানের প্রতি হতাশ হলো। বাঙালির মোহভঙ্গের পালা শুরু হলো। এমনকি যারা পাকিস্তানকে একটা 'ফেডারেল রাষ্ট্রে' পরিণত করলে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করতো, তারাও পাকিস্তানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিলো।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫) ও বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া

আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে মিলিটারী মেজাজে দেশের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে থাকে। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি এড়াবার জন্য কাশ্মীর সমস্যাকে পুনরুজ্জীবিত করে। শুরু হয় রান অব কুচ (Rann of Kutch) ও কাশ্মীর নিয়ে স্বঘোষিত যুদ্ধের মহড়া। ৬ সেপ্টেম্বর ঘোষণা দিয়ে আইয়ুব ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ভারত লাহোরে পাল্টা আক্রমণ করে বসে। এ যুদ্ধে পাকিস্তান নাস্তানাবুদ হয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ২০ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতির ঘোষণার নির্দেশ দিলে উভয় দেশই তা পালন করে। '৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৭ দিনের এই যুদ্ধে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলো। এমনকি বহির্বিশ্ব থেকেও বাংলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলো। পূর্ব বাংলাকে অরক্ষিত রেখে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি ও রশদপত্র, খাদ্য মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত না করে যুদ্ধে জড়িয়ে পাকিস্তানি সমর নায়করা বিশ্বের দরবারে তামাশার পাত্রে পরিণত হয়েছিলো। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি অবাঙালি নেতা ও সামরিক জান্তার নায়কদের গালভরা স্লোগান, শক্তিশালী কেন্দ্র ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অসারতা প্রমাণিত হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানিদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা জানা সত্ত্বেও ভারত সেদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নাই। ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ না করলেও বাংলায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হলে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধের সার্বিক অসহায়ত্বের চিত্র ধরা পড়ে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আরেকবার হামলা চালানো হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বেতার ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি, তাই তিনি হিন্দুস্তানের কবি। সুতরাং হিন্দুস্তান আমাদের শত্রু; তাই রবীন্দ্রনাথও আমাদের শত্রু।' কবি নজরুল ইসলামের গান থেকে হিন্দু ঐতিহ্যের ছাপ মুছে ফেলে 'ভগবানের জায়গায় রহমান', শ্মশানের জায়গায় গোরস্তান', 'রামধনুর জায়গায় রংধনু' এবং কৃষ্ণচূড়ার জায়গায় 'জয়তুন' বা খেজুর বাগান, এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে নজরুলের গান, গজল ও কবিতাকে মুসলমানীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। মূলত পাকিস্তানি শাসকরা পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে বাংলার বিনিময়ে যে

কাশ্মীর চেয়েছিলো; এ যুদ্ধের ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে যায়। আইয়ুবের মত একজন অদূরদর্শী সামরিক একনায়কের কর্মফলে গোটা দেশবাসীকে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিলো। তাই বাংলার স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তখন শুধুমাত্র আমাদের গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। বরং ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের মধ্যেও এর অপরিহার্যতা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও চিন্তার খোরাক যোগায়। এ সময় বাংলার স্বাধিকারের কথা এবং স্লোগান প্রকাশ্যে দেয়া শুরু হয়। এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা শেখ মুজিবকে 'ছয় দফা' দাবি পেশ করতে সাহস যুগিয়েছিলো। তেমনি আমরা 'নিউক্লিয়াস'র নেতারা ও বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা ছাত্রলীগের মধ্যে সরাসরিভাবে স্বাধীনতা ও জনযুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলতে সুযোগ ও সাহস পেয়েছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার গণধিকৃত গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত থাকার বাসনা প্রকাশ করেন। ১৯৬৫'র ২২ মার্চ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোনায়েম খান উপস্থিত হলে ছাত্রনেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে চেয়ার, ফুলের টব ইত্যাদি মঞ্চের দিকে মোনায়েম খানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে থাকে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। মোনায়েম খান পালিয়ে যান। কে. এম ওবায়দুর রহমান ও সিরাজুল আলম খানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। শেখ ফজলুল হক মণি এবং আসমত আলী শিকদারের এম.এ. ডিগ্রি বাতিল ঘোষণা করা হয়। কে.এম. ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান ও সাওগাতুল আলম সগীরকে ৫ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। আলী হায়দার ও শহিদুল হক মুন্সীসহ পাঁচ জন ছাত্রকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার হয়। ছাত্র নির্যাতনের সংবাদ ছাপানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

বাংলা প্রচলন সপ্তাহ

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে 'বাংলা প্রচলন কমিটি' নামে একটা সংগঠন দাঁড় করানো হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে 'বাংলা ভাষা' ব্যবহার করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে সকল দোকানপাটসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে '৬৬

সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই বাংলা ব্যবহার চালু করার আহ্বান জানান হয়। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গাড়ির নাম্বার প্লেট, বাড়ির নামফলক ও নাম্বার এবং দোকান-অফিসের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার আবেদন করা হয়। রথখোলার মোড় থেকে ইসলামপুর, লক্ষ্মীবাজার ও বাংলাবাজার পর্যন্ত সকল দোকান ও অফিসের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন সুধীর কুমার হাজরা ও শামসুল আলম হাসু।

১৯৬৬ সালে সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেদিন ছাত্রলীগ সভাপতি মাজহারুল হক বাকী ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমীর বটমূলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেব বলেন, 'সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন, সরকারি দফতরে বাংলা চালু এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করা হয়। এই অবহেলার ফলে বাংলার মানুষ স্বাধীনতার দাবি করতে বাধ্য হবে।' সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ ভাষণ। এরপর তিনি মারা যান।

ছাত্রলীগের কর্মী সংগঠকরা গাড়ির নাম্বার প্লেট, বাড়ির নামফলক ও নাম্বার, দোকানের সাইনবোর্ড এবং অফিস আদালতে বাংলা ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন মিটিং ও মিছিল সহকারে গিয়ে সদরঘাট থেকে নবাবপুর পর্যন্ত সকল দোকানপাট অফিস আদালতের সাইনবোর্ড পরিবর্তনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত এবং ছাত্রলীগ তথা জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের পরবর্তী কর্মতৎপরতা, প্রচার-প্রচারণা এবং সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের অভিযানের সুফল অচিরেই পাওয়া যেতে শুরু করে। ইনভেলপের ওপরে বাংলায় ঠিকানা লিখতে সচরাচর 'পোস্টাফিস'-এর পরিবর্তে 'ডাকঘর' লেখা, ইনভেলপকে 'খাম' বলা, হাউস নাম্বার এর পরিবর্তে 'বাড়ি নাম্বার' লেখা, রোড নাম্বারকে 'সড়ক নাম্বার' লেখা, স্যার/জনাব ইত্যাদির পরিবর্তে মহোদয়/সুধী লেখা 'ক্লাস রুম'কে 'শ্রেণি কক্ষ' লেখা, রোল নাম্বারকে 'ক্রমিক মান' লেখা, - এ রকম দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাংলা শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমতো জোয়ার দেখা দেয়। দোকানের সাইনবোর্ডগুলোতে বাংলা ব্যবহারে রীতিমতো প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে যায় এবং তখনকার দিনের ক্ষুদ্র পরিসরে 'নতুন ঢাকা'র একটি সড়কতো উনসত্তরের পর রীতিমতো হয়ে ওঠে এক 'বাংলা

পাড়া'। এই সড়কের দোকানগুলোর সাইনবোর্ড লিখতে যেন রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের শরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতা শুরু হয়ে যায়। যেমন ধরুন: ময়ূরাক্ষী, নয়নতারা, বনলতা, ধানসিঁড়ি, কনক, সোনারতরী, ময়ূরী, আঁকা বাঁকা - এই ধরনের সব তখনকার দিনের হিসেবে রীতিমতো পিলে চমকানো এবং কিছুটা দু:সাহসী নামকরণের প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সড়কটি হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড বা ল্যাবরেটরী রোড, কেউ কেউ এ নামও বাংলাকরণ করে 'হাতি সড়ক' বা 'গবেষণাগার সড়ক' পর্যন্ত লিখতে শুরু করেন। ল্যাবরেটরী রোডের সে আমলের আরেকটি বিখ্যাত বাংলা নামের দোকান (সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রও বলা যেতে পারতো), রুচিশীল মানুষের সঙ্গীত পিপাসা নিবারণের অন্যতম ঠিকানা, ধ্রুপদী গানের রেকর্ড বিক্রেতা 'গীতালী' দু'বছর আগেও টিকে ছিলো। শেষের দিকে ওরা গ্রামোফোন রেকর্ডকে আধুনিক করার চেষ্টা করে। সাইনবোর্ডটি এখনও আছে, তবে সেটি এখন জুতোর দোকান। বলাকা ভবনের নিচতলার 'বইপত্র'তো বহু আগেই উঠে গেছে জুতোর গুঁতো খেয়ে। কাকতালীয়ভাবে নিউ মার্কেটের দুর্লভ বই-পুস্তক পত্র-পত্রিকা বিক্রির দোকান 'নলেজ হোম'ও এখন চামড়াজাত সামগ্রী বিক্রেতা। এই নলেজ হোমে ৬৮/৬৯ সালে বিক্রি হতো দু'আনা দামের সেই বিখ্যাত এক্সারসাইজ খাতা, যার মলাটে ছোট্ট করে লাল অক্ষরে লেখা থাকতো নেতাজীর সেই আগুন ধরানো উক্তি 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো'। কাল পরিক্রমায় এ বাংলা প্রীতি এখন বাংলা বর্জনের পথে অগ্রসরমান। বিশেষত: নব্বই পরবর্তীকালে এই উল্টোমুখী প্রবণতা দৃশ্যমান হতে শুরু করে এবং যেনো বা আমাদের 'নতুন পাওয়া গণতন্ত্র'র ধাক্কায় এই 'বাংলাপাড়া' ক্রমে 'হলিউডি পাড়া'য় পরিণত হয়ে ওঠে। উপরে বর্ণিত সবকাজের সিদ্ধান্ত আসতো 'নিউক্লিয়াস' থেকে।

৬ দফা কর্মসূচি ও '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধীদলসমূহ এক জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হয়। সম্মেলনে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে ৬০০ এবং পূর্ব বাংলা থেকে মাত্র ২১ জন উপস্থিত ছিলো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব অন্যান্য ৪ জনসহ সম্মেলনে যোগদান করেন। ঐ সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন এবং বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন দাবি করেন। কিন্তু পশ্চিমা নেতারা তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি গ্রহণ করতে পারেননি। শুধু আইয়ুব বা ক্ষমতাসীন চক্র নয়, বিরোধী অবাঙালি



তোফায়েল আহমদ

নেতারাও বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। মূলত: এই সম্মেলনের আয়োজকরা সবাই ছিলো পাকিস্তানের সাবেক ক্ষমতাসীন রাজনীতিক। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আইয়ুব বিরোধী ক্ষুব্ধ জনগণের আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে জনতার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং জনতার আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা আরোহণের ব্যবস্থা করা। সম্মেলনের প্রস্তাবনায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অগ্রাহ্য করায় ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব সদলবলে সম্মেলন থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। পরে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে লাহোর সম্মেলনের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন। ঐদিন লাহোর বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি 'ছয় দফা' কর্মসূচির ঘোষণা দেন। একই দিন ঢাকা বিমানবন্দরেও সাংবাদিক সম্মেলনে 'ছয় দফা'র ঘোষণা ও লাহোর সম্মেলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত 'পৃথক মুদ্রা', বৈদেশিক বাণিজ্য এবং 'প্যারামিলিটারি' গঠন ছিলো কনফেডারেশনেরই কনসেপ্ট।

শেখ মুজিব ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা দেয়ার আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করেননি। তাই প্রথমদিকে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকজন ছাড়া অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতারা ৬ দফার বিরোধিতা করেন। তবে আওয়ামী লীগ কমিটিতে শেখ মুজিব ৬ দফা পেশ করলেও গৃহীত হতো কিন্তু তার চেহারাটা কেমন হতো বলা কঠিন। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ কমিটিতে ৬ দফা পেশ না করে একটি অগণতান্ত্রিক কাজ করেছিলেন এ ধরনের চিন্তা এক সময় আমার মধ্যেও ছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃত্বে থাকা অন্যান্যদের প্রতি আমার আস্থা কম থাকায় এই নিয়মভঙ্গকে দোষণীয় মনে হয়নি। আজ অনেকেই ৬ দফার প্রণেতা খুঁজে বেড়ান। প্রণেতা খুঁজে বের করার কাল্পনিক গবেষণার কথাও শুনে আসছি। সে সময় অনেকেই বলেছিলেন যে এই কর্মসূচিতে দেশটাকে ভাঙতে বিদেশি হাত আছে। আবার কেউ কেউ সিআইএ-এর দেয়া কর্মসূচি বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন। যারা এসমস্ত কথা সেদিন বলেছিলেন, তারা আর যা-ই করে থাকুন না কেনো মূলত: পাকিস্তানিদের পক্ষেই


শহীদ ড. শামসুজ্জোহা

কথা বলেছিলেন। রাজনীতিবিদ ও প্রগতিশীলদলের লোকেরা যারা এর বিরুদ্ধে বলেছিলেন তারা ভুল রাজনীতির আবর্তে আটকে থেকে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের কর্মসূচি কখনই প্রচারসর্বস্ব বা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পরিধি ডিঙ্গিয়ে মাঠের কর্মসূচিতে পরিণত হতে পারে না। কারণ উন্নয়নশীল বিশ্বে সমস্যায় জর্জরিত মানুষকে মাঠের আন্দোলনে টেনে নিলে তা যে কোন সময় 'গণঐক্য' সৃষ্টি করে 'বিষ্ফোরণ' ঘটাতে পারে। তাই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বুমেরাং হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি।

আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেব তাঁর দ্বিতীয় ছেলে শামসুল আলম হাসুকে দিয়ে সিরাজুল আলম খান ও আমাকে ডেকে পাঠান। আমারা দু'জনে মাওলানা সাহেবের বনগ্রাম লেনস্থ্ বাসভবনে গেলে তিনি আমাদের বললেন যে শেখ মুজিব এককভাবে ৬ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন। আমি আওয়ামী লীগ-এর সভাপতি। আমাকেও কিছু জানাননি। এই ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো গণতন্ত্রকামী মানুষের বিরোধিতা করা উচিত। প্রতিবাদ না করলে মুজিব 'ডিক্টেটর' হয়ে যাবে। তিনিও ৬ দফা কর্মসূচিকে শেখ মুজিবের বাইরের কোন শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করা কাজ বলে জানান। তবে তিনি নিশ্চিত কোনো তথ্য দেননি। তিনি সিরাজ ভাই ও আমাকে একটা বিবৃতি দিতে বলেন। বিবৃতিতে বলতে হবে শেখ মুজিবের ৬ দফার সাথে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মাওলানা সাহেবকে বোঝালাম- 'আমি তো খুব ছোট পদের অধিকারী আর সিরাজ ভাইও ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। আমরা বিবৃতি দিলে বস্তুত কোনো কাজে লাগবে না'। ছাত্রলীগ সভাপতি সৈয়দ মাজহারুল হক বাকী এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের সাথে আলোচনা করে কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে ফিরে আসি।

আমি তখন ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সভাপতি। পরে ঢাকা শহর কমিটির মিটিংয়ে অনেকের অনেক বিরোধিতার পর ৬ দফার সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি

ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে আমার ও আবুল কাসেমের নামে পত্রিকায় বিবৃতি যায়। ৬ দফার প্রতি আমাদের সমর্থন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যে বেশ প্রভাব ফেলে। পরদিন রাজ্জাক ভাই আমাদের জানালেন, 'শেখ মুজিব ভাই তোমাকে ডেকেছেন'। জগন্নাথ কলেজ সংসদের ভিপি রাজিউদ্দিন ও আমি ৩২ নাম্বার ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করি। সেখানে আবদুর রাজ্জাকও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘন্টা তিনেক তাঁর সাথে আলোচনা হয়। একপর্যায়ে বললাম, 'মুজিব ভাই, আপনি যদি ৬ দফার প্রশ্নে আপোষহীন থাকেন, বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য আমরা শেষ লড়াইটা লড়তে প্রস্তুত। এরপর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাকী ভাই ও সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক ভাই ৬ দফা সমর্থন করে বিবৃতি দেন। 'নিউক্লিয়াস'-এর প্রচেষ্টায় ছাত্রলীগের ভেতর সৃষ্ট র‍্যাডিক্যাল গ্রুপটিই ৬ দফার পক্ষে সমর্থন আদায়, প্রচার অভিযান ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করেছিলো। উল্লেখ্য যে, ৬ দফা ঘোষণার পর, এর সমর্থনে 'নিউক্লিয়াস'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক মিছিল বের হয়, যা জনমনে বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো। *[এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখনকার ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ।]-সম্পাদক*

৬ দফার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি

এক নাম্বার দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবি করা হয়।

দুই নাম্বার দফায় দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ফেডারেল সরকারের হাতে রাখার কথা বলা হয়।

তিন নাম্বার দফায় দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক মুদ্রার কথা বলা হয়। অন্যথায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়।

চার নাম্বার দফায় ট্যাক্স, খাজনা এবং কর ধার্য ও আদায় আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করার কথা বলা হয়।

পাঁচ নাম্বার দফায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকার কথা ছিলো যা নির্ধারিত হারে ফেডারেল সরকারের কাছে জমা হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য মূলত আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে।

ছয় নাম্বার দফায় ছিলো যে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি বাহিনী আঞ্চলিক সরকার দ্বারা গঠিত হতে পারবে। এই ছিলো ছয় দফা কর্মসূচি।


শহীদ মতিউর

৬ দফায় সেদিনের বৈষম্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর তার সম্মানজনক ও সন্তোষজনক সমাধানও দেয়া হয়েছে। তাই মাওলানা তর্কবাগীশ, সালাম খান ও যশোরের মশিউর রহমান সাহেবরা বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ৬ দফা কর্মসূচি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। সারা দেশে ৬ দফা প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শেখ মুজিব '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী থাকাকালে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ থেকে দেশে দুর্নীতি থাকবে না। আপনারা তিন পয়সার পোস্টকার্ডে আমার কাছে দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর লিখে পাঠাবেন। আমি তার ব্যবস্থা করবো। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করবো।' জনগণ একথা ভুলতে পারেনি। কিন্তু দেশ দুর্নীতিতে ভরে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের প্রতিও বিরূপ ধারণা পোষণ করতো।

শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গের প্রচার অভিযানের সময় তাঁর অনুরোধে তাঁর সফরের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্রলীগ সভাপতি বাকী সাহেব ও আমি উত্তরবঙ্গ সফরে যাই। রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া থেকে ফিরে রাজশাহীতে এসে পৌঁছালাম। ওই সব শহরে আওয়ামী লীগ খুবই দুর্বল। তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ক্ষমতায় ছাত্রলীগ। রাকসুর সভাপতি আবু সাঈদ (অধ্যাপক, পরে বাকশাল নেতা, মন্ত্রী) আর সরদার আমজাদ হোসেন (পরে মন্ত্রী) সাধারণ সম্পাদক। আমরা শুনতে পেলাম যে রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে রাজশাহী শহরে ঢোকার পথে শেখ মুজিবকে কালো পতাকা দেখাবে। রাজশাহী সরকারি কলেজে মোনায়েম খানের (গভর্নর) সৃষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠন 'এনএসএফ' শক্তিশালী ছিলো। আমরা মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেই। অনেক চেষ্টা করে রাজশাহী কলেজে নুরুল ইসলাম ও আনফোরকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের শাখা দাঁড় করাই। শেষ পর্যন্ত বিনা বাধায় শেখ মুজিব বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ঐ সভায় শাহ্ মোয়াজ্জেম ও মিজানুর রহমান চৌধুরী বক্তৃতা দেন। পাবনায় আওয়ামী লীগের অবস্থা ভালো ছিলো।

কিন্তু আমজাদ সাহেব ছাড়া অনেকেই আইয়ুবী শাসনের ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। ওই মিটিংয়ের সাফল্যের জন্য সৈয়দ রেজা কাদের ভাই (প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা) ও আহমদ রফিকের অবদান ভোলার নয়। শেখ মুজিবের বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহীর মিটিংয়ে বাকী ভাই ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র প্রচার অভিযানের ফলে ৬ দফা কর্মসূচি ভিত্তিক গণ-ঐক্য সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমদিকে মোনায়েম খান তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা না দেখলেও ৬ দফার জনপ্রিয়তা আর শেখ মুজিবের জনসভায় লোক সমাগমে আইয়ুবের সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কেঁপে ওঠে এবং আইয়ুব-মোনায়েম চক্র শেষের দিকে শেখ মুজিবের প্রতিটি জনসভায় দেয়া বক্তৃতার অজুহাতে একটা করে মামলা দাঁড় করাতে শুরু করে। প্রতি জেলায় তাঁকে একবার করে গ্রেফতার করা হয়েছে। জামিনে মুক্তি পেয়ে তাঁকে পরবর্তী জনসভায় অংশ নিতে হতো। এই প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিব ও 'ছয় দফা'র প্রচার অভিযান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বদলে সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'ছয় দফা' বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাংলার মানুষের কাছে আপোষহীন আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের উত্থান ঘটে। মামলায় গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি, শেখ মুজিবকে নিয়ে এমন খেলার অবসান হলো। '৬৬ সালের ৮ মে রাত ১টায় দেশরক্ষা আইনের ৩২ নাম্বার ধারায় পুলিশ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে আর মুক্তি দেয়নি।

৭ জুন ৬ দফা দিবস ও শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে 'দাবি দিবস' পালন করা হয়। ৭ জুন সারা দেশে 'হরতালে'র আহ্বান করা হয়। এর আগেই আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হয়ে যান। হরতাল পালনের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা শহরে দু'টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। জগন্নাথ কলেজের দায়িত্ব পড়ে পুরাতন শহরের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নতুন ঢাকার। মোনায়েম খান তার গুণ্ডা বাহিনী 'এনএসএফ' ও মুসলিম লীগের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখার দায়িত্ব দেন। এসময় খুব কমই শ্রমিক নেতা আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তেজগাঁওয়ের শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়া ও ঢাকা জুটমিলের চটকল শ্রমিকনেতা পোস্তাগোলার আবদুল মান্নান। হরতালের দিন ভোরের দিকে কলকারখানা চালু রাখার জন্য পুলিশি ছত্রছায়ায় গুণ্ডাবাহিনী মারপিট ও বল প্রয়োগ করে। এদিকে জগন্নাথ কলেজ

এলাকার লায়ন সিনেমা এলাকায় 'নেংড়া মোবারক' নামের কুখ্যাত খুনী তার দলবল নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে। যতবার 'নেংড়া মোবারক' আক্রমণ করেছিলো ততবারই জনগণ ও পার্টিকর্মী নিয়ে আমরা তা প্রতিহত করেছি। এতো বাধার পরও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের কোনো কলকারখানা চালু হয়নি। পূর্ণ 'হরতাল' পালিত হয়। কিন্তু বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় এবং তেজগাঁও এর নাখাল পাড়ায় সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রমিক-ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের সংঘর্ষ চলে। তেজগাঁও এর শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ সারা দেশে প্রায় ১৫ জন নিহত ও প্রায় ২০০ জন আহত হয়। তেজগাঁও এলাকায় পুলিশ ও ইপিআর শ্রমিক-জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি অফিস ও জজকোর্টে জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। সরকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে 'কারফিউ' জারি করে। পরদিন থেকে ঢাকা শহরের রাস্তায় সেনাবাহিনী নামানো হয়। কিন্তু সরকারের সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতনের পরও বাংলার মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবি যৌক্তিকতার আলোকে সমাধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক বিক্ষোভের এ পর্যায়ে আদমজী শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ৭ জুন ২০ হাজার আদমজী শ্রমিক ১৫/১৬ মাইল হেঁটে ঢাকায় আসে।

৬ দফা কর্মসূচি মূলত: '৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় রচিত হয়েছিলো। যুদ্ধকালে এই অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা এবং পাকিস্তানের বিশ বছরে পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলের বৈষম্যের ফলে ৬ দফা প্রণীত হয়েছিলো। '৬৬ সালের প্রথম দিকে আইয়ুব খান ঢাকায় এলে শেখ মুজিবের সঙ্গে এক বৈঠকে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তখন শেখ মুজিব আইয়ুবের সাথে ৯টি দফা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে এই ৯টি দফাকে আরো বাস্তবমুখী ও সমৃদ্ধ করে ৬ দফা আকারে লাহোরে শেখ মুজিব ঘোষণা দেন। যুদ্ধকালে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে বাঙালি অর্থনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে গিয়ে 'লাহোর প্রস্তাব'র ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার গঠন করাকেই গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে মনে করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, শামসুর রহমান, আহমেদ ফজলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুসের উদ্যোগী ভূমিকাসহ বেশকিছু সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের অবদান হিসেবে ৬ দফাকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু ৬ দফা উত্থাপনের কাল, উপস্থাপনা, আন্দোলনে প্রচার ও সর্বোপরি ৬ দফাকে

বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত করার কলাকৌশল সব কিছুর জন্য প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র শেখ মুজিবই এবং ছাত্রলীগ ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্যদেরই।

৬-দফা ঘোষণার পরপরই শেখ মুজিব সিরাজ ভাই ও মণি ভাইকে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে ডেকে পাঠান। তাদের হাতে ৬-দফার দু'টি কপি দিয়ে পড়তে বলেন। সিরাজ ভাই পড়া শেষে শেখ মুজিবের সঙ্গে আর দেখা না করেই সরাসরি রাজ্জাক ভাই ও আমাকে ৬-দফার বিষয়টি দেখান এবং পড়তে বললেন। সে মুহূর্তেই আমরা 'নিউক্লিয়াস' সিদ্ধান্ত নিই ৬-দফাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৭ জুনের পরবর্তী পরিস্থিতি

১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবি আদায় ও শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ বাঙালির উত্তাল তরঙ্গকে হত্যা, গুলি, বেয়োনেট আর জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিলো বটে। কিন্তু তথাকথিত শক্তিশালী পাকিস্তানের ঘরে যে আগুন লেগেছিলো তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আর নেভাতে পারেনি। বাংলা ও বাঙালি ৬ দফার আন্দোলনকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলো। পাকিস্তানের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে বাঁচার জন্য তরুণ ছাত্র ও যুবকরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা পায়। বাঙালি জাতির হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সবসময়ই ছিলো পাকিস্তানের জন্য মাথাব্যথার কারণ। ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে না দেয়ায় বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদেই প্রতিবাদ করেছিলেন। '৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে 'উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে' বলে যে দাম্ভিক ঘোষণা করেন তা সাথে সাথে বাংলার মানুষের প্রতিবাদে ধুলায় লুটিয়ে যায়। এর পরিসমাপ্তিতে ঘটে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বারের বুকের তাজা রক্তে লেখা প্রতিবাদ। '৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। 'যুক্তফ্রন্ট'র জয়লাভ পাকিস্তানের শাসকচক্রকে আতঙ্কিত করে তোলে। আমলাতন্ত্র ও সামরিক চক্রের মদতপুষ্ট রাজনৈতিক নেতারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। পাকিস্তানি সামরিকগোষ্ঠী ও শিল্পপতিরা একাত্ম হয়ে যায়। ওরা আদমজিতে বাঙালি ও বিহারীর দাঙ্গা সৃষ্টি

করে সোহরাওয়ার্দী ও হক সাহেবের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। 'যুক্তফ্রন্ট' বিভক্ত হয়ে 'আওয়ামী লীগ' ও 'কেএসপি' মন্ত্রীসভার সৃষ্টি হয়। ২১ দফা বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ হয়। এতো করেও তারা যখন উদ্ধারের পথ পেলোনা, তখন ঔপনিবেশিক শক্তির শেষ রক্ষাকবচ সামরিক জান্তাকে ক্ষমতা হাতে নিতে হলো। বাঙালি আবারও শৃঙ্খলিত

শহীদ আসাদ

হলো। ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত দিন ৭ অক্টোবর '৫৮ সাল। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতে '৬২ এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে সামরিক জান্তা বিরোধী গণবিস্ফোরণ ঘটে। জুন মাসে একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তা কার্যকরী করা হয়। আইয়ুবের উদ্ভট আবিষ্কার 'মৌলিক গণতন্ত্র'র নামে ৪০ হাজার বাঙালিকে সামরিক জান্তার সেবাদাসে পরিণত করা হলো।

'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করে দেশে ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নামের চরিত্রহীন রাজনৈতিক টাউট সৃষ্টি করা হলো। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও হামুদুর রহমান 'শিক্ষা কমিশন' নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তোলা হলো। 'দেশের শিক্ষা ভাগ্যবানদের জন্য' নীতি চালু হয়। আইয়ুবের গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিবাদ না হলেও বাংলাদেশে প্রতিবাদই শুধু ওঠেনি বরং ১৭ সেপ্টেম্বর '৬২ সালে বাবুল, ওয়াজিউল্লাহর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে 'আইয়ুবী শিক্ষা সংকোচন নীতি'র পরিসমাপ্তি ঘটে। শাসনতন্ত্র ও মৌলিক গণতন্ত্র দিয়ে আইয়ুব তার 'উন্নয়নের এক দশক' সৃষ্টি করলেও '৬৮ সালের আগস্ট মাস থেকে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তা দাবানলের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৬ দফা, ১১ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী 'গণঅভ্যুত্থান'র ফলে এতোদিনের 'লৌহমানব' ভেজা 'বেড়াল' হয়ে '৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে ধিকৃত, ঘৃণিত ও জনগণ কর্তৃক বর্জিত নেতাদের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে বসার ঘোষণা দেন। পরবর্তী ঘোষণায় আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে জানান। কিন্তু কোনো কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারেনি। আইয়ুব '৬৯ সালের ২৫ মার্চ বিদায় নিলেন।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে এক গবেষকের আবিষ্কার

একজন ইতিহাসবিদ ও গবেষক যিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বলেও পরিচিত এবং বামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের একজন। তিনি তার বই 'আসাদ ও

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান'-এর ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ঊনসত্তরের দেশ কাঁপানো গণঅভ্যুত্থানের প্রাথমিক ঘটনা পাকিস্তানের পূর্বাংশে কম সংঘঠিত হয়, বরং বেশি হয়েছিলো পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে। আটষট্টি-ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পথ চলা শুরু করে একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে জুলফিকার আলী ভূট্টো রাওয়ালপিন্ডি সফর করছিলেন, তিনি তখন আইয়ুবের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। রাওয়ালপিন্ডির পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে তখন ছাত্র অসন্তোষ বিরাজমান। ঐ শহরের ৭০ জন ছাত্র 'চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য লান্ডিকোটাল' থেকে কয়েক হাজার টাকার মালামাল কিনে ফেরার পথে পুলিশ তাদের আটক করে এবং অবৈধ পণ্যগুলো বাজেয়াপ্ত করে।' এটা লেখক ড. মেজবাহ কামালের আবিষ্কার। লেখক এই ঘটনাকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হতে পারে। কোনোভাবেই এ ঘটনা আন্দোলনের সূত্র হিসেবে নেয়া যায় না।

আইয়ুবের দোসর, বিশ্বস্ত অনুচর সামরিক জান্তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতার অংশীদার ও কলঙ্কিত রাজনৈতিক জুলফিকার আলী ভুট্টো হঠাৎ করে '৬৬ সালের ১৮ জুন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াননি। চার মাস পরেই ৬ নভেম্বর বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ঘুরে গিয়ে বললেন, আমি আগে কখনোই ৬ দফা সমর্থন করি নাই, এখনো করবো না। অথচ এরপরই ভুট্টো ১৪ নভেম্বর আবার বাংলায় এসে আওয়ামী লীগের তখনকার নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন। তখন আওয়ামী লীগের প্রায় অধিকাংশ নেতারাই জেলে ছিলেন। ১৭ নভেম্বর আইয়ুব সরকার দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ ঘোষণা করে। '৬৪'র সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। '৬৪ সালে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার হোতা আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। '৬৫ সালের পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে ১৭ দিনের অবরুদ্ধ বাংলার অসহায়ত্বের জন্য আইয়ুবকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ৬ দফা দাবির মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপান্তর করা হয়। এসবই ছিলো পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির ধারাবাহিক আন্দোলন। '৬৮ সালের ৪ জানুয়ারিতে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিতে সকল ছাত্র সংগঠন পল্টনে মহাসমাবেশ ও মিছিল বের করে। ৯ আগস্ট ছাত্রলীগ এককভাবে দাবি দিবস পালন করে।

মিছিলে পুলিশ ই.পি.আর.-এর সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় ১০/১২ জন আহত হয়। এর প্রতিবাদে বিবৃতি দিতে না চাওয়ায় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন ও মতিয়া গ্রুপের তৎকালীন নেতাদের সাধারণ ছাত্ররা ঘেরাও করে বিবৃতি দিতে বাধ্য করে। এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস ('৬২) উপলক্ষে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) একত্রে কর্মসুচি পালন করে। ঐদিন থেকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের চেষ্টা চলে। তখনো ৬ দফা দাবিকে ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপের কেউই সমর্থন দেয় নাই। বিশেষ করে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের সমর্থন না দেয়ায় কর্মসূচি প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছিলো না। এরই মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি (CPB) ও ন্যাপ (মোজাফফর গ্রুপ) 'ছয় দফা'কে সমর্থন করায় আমরা কিছুটা সুযোগ পেলাম। কিন্তু তখন মেনন গ্রুপ 'ছয় দফা'কে সি.আই.এ.-এর পাকিস্তান ভাঙ্গার কর্মসূচি হিসাবে আখ্যায়িত করায় যৌথ কর্মসূচি প্রণয়নে বেশ কষ্টসাধ্য হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে মেনন গ্রুপ থেকে বলা হলো ছাত্রলীগ যদি কর্মসূচিতে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল পূর্বক 'সিয়েটো' (SEATO) 'সেন্টো' (CENTO) চুক্তি থেকে পাকিস্তানকে বেরিয়ে আসার দাবি করে, তাহলে তারা 'ছয় দফা' দাবিকে ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি আছে। সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশে আমরা রাজি হলাম। পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচিতে ৩ নং দফায় ৬ দফা এবং ১০ নং দফায় সিয়েটো সেন্টো চুক্তিসহ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি সম্বলিত ১১ দফা দাবি প্রণয়ন করা হয়। ১৭ জানুয়ারি থেকে লাগাতার আন্দোলনের মুখে ২০ জানুয়ারি আসাদের শহীদ হওয়ার মধ্যদিয়ে আন্দোলন আরো গতি লাভ করে। আর ২৪ জানুয়ারিতে স্কুলছাত্র মতিউরের মৃত্যু গণআন্দোলনকে 'গণঅভ্যুত্থানে' পরিণত করে। এই ইতিহাসের লেখক (ড. মেজবাহ কামাল) কোথায় লাভিকোটালের চোরাচালানকারী ছাত্রদের রক্ষার কারণ হিসেবে '৬৯এর গণ-অভ্যুত্থানকে খুঁজে সূত্র পেলেন বুঝে উঠতে পারিনি। '৬৮-'৬৯ এর এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আ স ম রব-এর বলিষ্ঠ ভূমিকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এন.এস.এফ

১৯৫৭ সালে গড়ে ওঠা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনকে পূর্ব পাকিস্তানের মোনায়েম খান নিজ তত্ত্বাবধানে 'এন.এস.এফ'কে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলেন। তিনি তাঁর প্রথম পুত্র বাচ্চু এবং বাচ্চু মারা গেলে পরে কনিষ্ঠ পুত্র খসরুকে দিয়ে ছাত্র

ফেডারেশনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রথমদিকে আবুল হাসনাত (ব্যারিস্টার), আব্দুল হালিম (হালিম ফেডারেশনের মালিক), আনোয়ার আনসারী ও মাহবুবুল হক দোলন 'এন.এস.এফ'-এর নেতা ছিলেন। পরে জমির আলী, সারোয়ার জাহান, আবু সুফিয়ান ও জাহাঙ্গীর ফয়েজসহ পেশীশক্তির অধিকারীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যক্তিদের বাছাই করে একটা সন্ত্রাসবাদী বাহিনী গঠিত হয়। আর্থিক সাহায্য, পুলিশি নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বিনিময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। তারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ছাত্র নামধারী এইসব জঘন্য ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করে। এদের কুকর্ম প্রতিহত করার কোনো ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা ছাত্র সংগঠনের ছিলো না। এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় খোকা ও সাইদুর রহমান (পাঁচপাত্তু) নামের দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে খুন, গুম, লুটতরাজ ও জনজীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। এই সন্ত্রাসী দলটির সঙ্গে '৬৪ সালের প্রথমদিকে মোনায়েম বিরোধী আন্দোলনের সময় পুরাতন কলাভবনের আমতলায় প্রকাশ্য সংঘর্ষে সিরাজুল আলম খানসহ প্রায় ৫০ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সরোয়ার জাহানসহ 'এন.এস.এফ'-এর অধিকংশ সন্ত্রাসবাদী সেদিন আহত হয়। '৬৫ সালে কলাভবনের বটতলায় আবারো ছাত্রলীগের সাথে সংঘর্ষ হয়। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য নাজমুল আহসান খান মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এর আগে ছাত্রলীগ সভাপতি মাজহারুল হক বাকীকে সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করে গুরুতর আহত করে। এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্ররা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কামরুল আলম খান খসরু ও মোস্তফা মহসীন মন্টু ছাত্রলীগের এইসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়াও খসরু-মন্টুর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের বেশ কিছু সদস্য নিয়ে 'এন.এস.এফ' বিরোধী বাহিনী গড়ে তোলা হয়। খসরু 'নিউক্লিয়াস'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই বাহিনীতে ইকবাল হলের কামালউদ্দিন আহমেদ ফিরু (পরে সেনাবাহিনীতে), মোত্তালিব (পরে পুলিশে), মহিউদ্দীন পারভেজ (পরে সিনেমা জগতে) এর নাম উল্লেখযোগ্য। আর জগন্নাথ কলেজ ও পরে সোহরাওয়ার্দী কলেজের এলাহী, তারন, কালু, সাদেক, জিন্নাহ ও নিজামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সন্ত্রাসবাদীদের সাথে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের ফলে ছাত্রলীগ 'মিলিট্যান্ট' সংগঠনের রূপ নেয়। 'এন.এস.এফ' প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার সংগঠনে পরিণত হয় ছাত্রলীগ। '৬৯ সালের আন্দোলনের এক পর্বে

'এন.এস.এফ'-এর মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। গণঅভ্যুত্থানে খোকার মতো দুর্ধর্ষ লোকও ভীত হয়ে পড়ে। কে বা কারা এই খুনীকে নারায়ণগঞ্জের 'পতিতালয়' থেকে ধরে এনে রেসকোর্স ময়দানে খুন করে ফেলে যায়। এমনি করে মোনায়েম খাঁর ধ্বংস, আইয়ুবের পতন ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পর্যায়ে কামরুল আলম খান খসরু ও মন্টুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ বিশেষ শক্তি অর্জন করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও নিউক্লিয়াস

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আরো দু'টি বিষয় উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। সেগুলোর একটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথিত আসামীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঐ মামলার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই স্বাধিকার আন্দোলনকে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরের উপলব্ধি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

তার সাথে '৬২ সালের সেপ্টেম্বরের শিক্ষা আন্দোলন'র পর প্রতিষ্ঠিত গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামক সংগঠনটির সুপরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠন বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ২৪ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিলো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। শেখ মুজিব, '৬১ সালে চিত্তরঞ্জন সূতার ও রুহুল কুদ্দুসকে নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁরা এ লক্ষ্যে একটি গোপন সংগঠন 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' গঠন করেছিলেন। সংগঠনটি জঙ্গী কর্মীবাহিনী সংগঠিত করে 'পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার আহ্বান' সম্বলিত একটি প্রচারপত্র '৬১ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলি করে। জঙ্গী কর্মীবাহিনী সংগঠিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মানসিকতা নিয়ে এক পরিকল্পিত ভাবনা কার্যকরী করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান '৬২ সালের ২৭ জানুয়ারি কুমিল্লা হয়ে আগরতলা রওনা হন। যথাস্থানে যে ব্যক্তিটির তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর কথা ছিলো, তিনি সময়মত উপস্থিত না থাকায় শেখ মুজিবকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার করে আগরতলা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে তাঁর পরিচয়

পাওয়ার পর সেখানকার জেলা প্রশাসক (ডি.এম.) তাঁর সাথে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে দিল্লিতে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে ডি.এম.কে অনুরোধ করেন। তিনি বুড়িচং থানা আওয়ামী লীগের নেতা এবং তৎকালীন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান জনাব আমীর হোসেন-এর বাড়িতে ফিরে আসেন (ইনি ১৯৭০ সনে এম.এন.এ. নির্বাচিত হন)। তাঁর সহায়তায় লঞ্চে করে নারায়ণগঞ্জ আসেন। সেখান থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরেন। বাড়ি ফেরার তিন ঘন্টার মধ্যে তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, এই তথ্য প্রকাশিত হয় '৬৬ সালের ৮মে, যখন 'ছয় দফা' প্রচার অভিযানের এক পর্যায়ে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষার আইনে গ্রেফতার করা হয়। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রলীগের নেতা রেজা শাহজাহানের নেতৃত্বে ছাত্ররা শেখ মুজিবের নিরুদ্দেশের সংবাদের প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবিতে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

এর পর হাইকোর্টে তার গ্রেফতারি নির্দেশনাকে চ্যালেঞ্জ করে রীট মামলা করা হয়েছিলো। হাইকোর্টে সরকারি উকিল শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কাজের সাথে লিপ্ত দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার জড়িত বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, হাইকোর্টে এ সম্পর্কে খোলামেলাভাবে কিছু বলা যাবে না। বিচারপতিদ্বয় তখন জেল গেটে ক্যামেরা ট্রায়ালের নির্দেশ দেন। যথারীতি সেই ক্যামেরা ট্রায়াল জেল গেটে হয় এবং সেখানে বলা হয়, 'শেখ মুজিব ভারতে গিয়ে ভারতের সাথে চক্রান্ত করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত'।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেওয়ানীতে ছিলেন। সেখানে নতুন ২০ সেলে আরেকজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ '৫৪ সালের গণপরিষদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সূতারও ছিলেন। জেলগেটে ক্যামেরা ট্রায়ালে শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন যে সরকার তার সবকিছু জেনে ফেলেছে। তাই তিনি সূতার বাবুকে বলেন যে তা এভাবে হবে না। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কিছুই হবে না। বিদেশি বন্ধু চাই। বেরুতে পারলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কারাগারে শেখ মুজিব ও চিত্তরঞ্জন সূতারের মধ্যে

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ও স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তর করার কলাকৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার কথাও আলোচনা হয়। পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র, জাতি ও মুক্তিকামী মানুষের সমর্থন আদায় একান্ত কাম্য বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাহায্য সহযোগিতা এবং ভারতের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অত্যন্ত জরুরি কাজ হিসেবে বিবেচনায় আসে। শেখ মুজিব শ্রী চিত্তরঞ্জন সূতারকে ভারতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দায়িত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দূত হিসেবে কোলকাতায় অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন। '৬৯ সালে হাইকোর্টে রীট আবেদনের মাধ্যমে শ্রী সূতার জেল থেকে বেরিয়ে মুজিবের দূত হিসেবে কোলকাতায় অবস্থান নেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে শ্রী সূতার ভারত সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন। এই সময়ে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী চিকিৎসার জন্য ভারত যান তখন তিনিও দূতিয়ালির কাজে সাহায্য করেন। এমনকি হানাদারবাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা বাঙালিকে ভারতে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে ভারতকে সহজে রাজি করানোর বিষয়ে শ্রী সূতার এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর অবদানকে ভোলা যায় না। এই সূত্র ধরেই ১৮ জুন '৬৮ সালে শেখ মুজিবকে সামরিক হেফাজতে ঢাকা সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুতর অভিযোগে ১ নম্বর আসামী রূপে অভিযুক্ত করে 'পাকিস্তান রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' নামক এক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। মামলা পরিচালিত হয় ঢাকা সেনানিবাসে। তিনজন সি.এস.পি. অফিসারসহ ৮ জন বেসামরিক ও ২৭ জন সামরিক ব্যক্তিকে জড়িয়ে (মোট ৩৫ জন) 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়।

(মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৮৯ সালের ২১ মে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার কাপাসাটিয়া গ্রামে। ময়মনসিংহ 'অনুশীলন' সমিতি- আন্দামান সেলুলার জেল, আজাদ হিন্দ ফৌজ- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলির মেম্বার নির্বাচিত হন। তাঁর লেখা বই 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'। ১৯৭০ সালের ০৯ আগস্ট ভারতে পরলোকগমন করেন। -সম্পাদক)

১৯ জুন মামলার সংবাদ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। এই মামলায় যে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয় তাঁরা হচ্ছেন: শেখ মুজিবুর রহমান, কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সাবেক এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ, এলএসসিডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান (সিএসপি), ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ, কর্পোর্যাল আবদুস সামাদ, সাবেক হাবিলদার দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস (সিএসপি), ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতি ভূষণ চৌধুরী, মানিক চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, সাবেক ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশিদ, খান মোহাম্মদ সামসুর রহমান (সিএসপি), একেএম সামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারি, সার্জেন্ট সামসুল হক, সামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন এ শওকত আলী মিঞা, ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এম নূরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লে. এম রহমান, সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, এবং লে. আবদুর রউফ।

২১ এপ্রিল সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধনী অর্ডিন্যান্সের ৪-ধারা অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে। তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালের সদস্য ছিলেন বিচারপতি এস.এ. রহমান চেয়ারম্যান (অবাঙালি), বিচারপতি মুজিবুর রহমান এবং বিচারপতি মাকসুমুল হাকিম। এ মামলায় আসামী পক্ষের কৌশলী হিসাবে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষজ্ঞ ইংল্যান্ডের রাণীর আইন উপদেষ্টা টমাস উইলিয়ামসহ ড. আলীম আল রাজী, আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, জহিরউদ্দিন, আমিনুল হক (পরবর্তীতে এটর্নী জেনারেল), জুলমত আলী, আমীরুল ইসলাম, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও শাহেদ সোহরাওয়ার্দী এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ আইনজীবীরা। আর সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আইয়ুবের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুরুল কাদের,



টি.এইচ.খান (পরে বিচারপতি) এবং আবদুল আলিমসহ অনেকে।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

এই মামলায় শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং মামলার বিরুদ্ধে জনগণের সহিংস প্রতিরোধ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই স্বাধিকার আন্দোলনকে সশস্ত্র হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি '৬৯ সালে বিচারাধীন বন্দি অবস্থায় বিমান বাহিনীতে কর্মরত সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গুলি করে হত্যা করে। পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি জহুরের লাশকে নিয়ে বাংলার ছাত্র সমাজ ও ঢাকা শহরের মানুষ স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সার্জেন্ট জহুরের ভাই এ্যাডভোকেট আমিনুল হক (পরে এটর্নী জেনারেল) এর বাসা থেকে মিছিল পরিবাগের দিকে রওনা হয়। তৎকালীন হাতিরপুলের উপর মিছিলটি উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানের শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরপরই ঢাকার নবাব ও প্রাক্তন মন্ত্রী খাজা হাসান আসকারীর বাসভবন এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি খাজা খায়রুদ্দিনের (পরিবাগস্থ) বাস ভবনে জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ঐ মিছিলে মানুষের ঢল নামে। লক্ষাধিক মানুষের মিছিল বাংলা একাডেমির পাশের লাল বাংলো (বর্তমান নিউট্রিশন ভবনের পাশে) আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস.এ. রহমানের বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিচারপতি এস.এ. রহমান কোনমতে বাসার কর্মরত লোকজনের সাথে মিশে গিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং চিরদিনের জন্য করাচি পাড়ি জমায়। ঐদিন জনতা নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি ও বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ি লুট করে এবং বায়তুল মোকাররমের দুটি আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান লুট করে। মিছিল সহকারে জনতা অস্ত্রশস্ত্রগুলো ইকবাল হলে এসে আমাদের হাতে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীতে পূর্ব বাংলায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করা আর সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, '৬৮ ও '৬৯-'৭০ এ অনুষ্ঠিত আন্দোলন এবং এর খুঁটিনাটি, পর্যায়, কৌশল এককভাবে 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে সিরাজ ভাই ঠিক করতেন। আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি, বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অন্য সব ছাত্র সংগঠন বিনা



শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক
(জন্ম: ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৪। শহীদ: ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৬)
ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিকের ইচ্ছা ছিলো পাইলট হওয়ার। ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ মিছিলে যোগ দিয়েছিলো সে এবং রাজপথে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। তাঁর জীবনদান আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন তীব্র করে তোলে। শহীদ মতিউরের আলোকচিত্র, হাতের লেখা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ



বাক্যে মেনে নিতো। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর দক্ষতা ও নিপুনতা পরবর্তী সময়ে '৭১ এর নির্বাচন, অবাঙালি প্রশাসন ভেঙে পড়লে সমান্তরাল প্রশাসনিক কর্মকৌশল তাঁর মেধা ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সকলের কাছে জাতীয় পর্যায়ের এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অবাঙালি প্রশাসনের পরিবর্তে তাঁর মেধা ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা হয় ছাত্র ব্রিগেড, যুব ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড, কৃষক ব্রিগেড, জয় বাংলা বাহিনী, নারী ব্রিগেড। যাতে গোটা দেশে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা না ঘটে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, ট্রেন চলাচল, স্টীমার চালু রাখা, বাজার ব্যবস্থাকে চালু রাখা সহ সকল প্রকার প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। আন্দোলনকে গণমুখি করার এ কৌশল অবলম্বনের একক কৃতিত্ব 'নিউক্লিয়াস'-এর এবং সিরাজুল আলম খান-এর। অসহযোগ আন্দোলনকে পুরোপুরি সফল করার কৃতিত্ব 'নিউক্লিয়াস'-এর।

ভারতে অতি সহজে এবং স্বল্প সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সব সংগঠিত সংগঠনসমূহের ভূমিকা ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞদেরকেও অবাক করে দিয়েছিলো। সিরাজুল আলম খান-এর এ ধরনের তৎপরতা এবং 'নিউক্লিয়াস'-এর কার্যক্রম কিউবা, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের সময়কার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

আন্দোলনের তীব্রতায় আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি বাংলা ছেড়ে পালিয়ে গেলে বিচারকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব হয় না। তাই ২২ ফেব্রুয়ারি '৬৯ সালে আগরতলা মামলা তুলে নেয়া হয় এবং শেখ মুজিবসহ ৩৪ জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয় বিনা শর্তে। '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ঘোষণা দিয়ে 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত এবং রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'র পক্ষ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ মহাসভাতে সিরাজুল আলম খান-এর পরামর্শেই তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্ত মানুষ হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুবের সাথে মিলিত হন। গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। ৬ দফা ও ১১ দফাকে গুরুত্ব না দেয়ায় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। দেশের আপামর মানুষের দাবি আদায়ের প্রশ্নে ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে শেখ মুজিব অটল ছিলেন। পাকিস্তানের এককালের লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান নিরবে ২৫ মার্চ '৬৯ সালে ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় নেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসেন। মাওলানা ভাসানী এই গোল টেবিল আলোচান বর্জন করেন এবং শেখ মুজিবকে গোলটেবিল আলোচনায় যেতে নিষেধ করেছিলেন।

আজ অনেকেই এ মামলার নেপথ্য ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। অনেকে এ মামলাকে পাকিস্তানি সামরিক চক্রের বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে নিছক 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখেন। অনেকে আবার ক্ষমতাসীনদের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা জনিত সাধারণ মামলা হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা কঠিন নয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালির জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যা বাঙালি জাতিসত্তার চেতনা

ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে নেয়ার ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছিলো।

১৯৬১ এর ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' গঠন করেছিলেন। 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' আর এগোয়নি। এরপর '৬২ সালে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ 'নিউক্লিয়াস' গঠন করেন। এই 'নিউক্লিয়াস' 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নাম দিয়ে গোপনে সংগঠনের কাজ ত্বরান্বিত করে। '৬২ সাল থেকে '৭১ সালের '২৫ মার্চ' পর্যন্ত সফলতার সাথে বাংলার ছাত্র যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক গণঅন্দোলন সৃষ্টি করে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এটা স্পষ্ট যে মুক্তিপাগল বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে কাজ করলেও নিজের মাতৃভূমি ও নিজেদের দাসত্বের থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তারাও ঐ প্রচেষ্টাকে শুধুমাত্র সামরিক অভ্যুত্থান হিসাবে না খুঁজে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই ঐ প্রচেষ্টা ছিলো পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙালির সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিলো শাসক ও শোষকের সৃষ্টি বুমেরাং অস্ত্র যা শাসক চক্রকেই ঘায়েল করেছিলো। এই মামলাই বাঙালিকে পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে বাঁচবার আত্মবিশ্বাস, ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র হবার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে।





নিউক্লিয়াস বা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তিন স্রষ্টা যথাক্রমে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াস

জেনারেল আইয়ুব খান এর সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই আমি (কাজী আরেফ আহমেদ) স্বাধীনতার চিন্তা ভাবনা শুরু করি। এ নিয়ে প্রথমে শেখ ফজলুল হক মণির সাথে আলাপ করি; কিন্তু সে সময়ে দু'জন একমত হতে পারিনি। পরে সিরাজুল আলম খান ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাহলে (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং আমি তাঁর সাথে একমত হই। নভেম্বর মাসে (১৯৬২'র) বাংলার স্বাধীনতা এবং বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি তথা বাঙালির 'জাতীয় রাষ্ট্র' বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন, সংগ্রাম ও লড়াইয়ের জন্য সুশৃঙ্খল জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা (সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও আমি) 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করি। '৬৪ সালের জুলাই মাসে এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট 'নিউক্লিয়াস' বা 'হাইকমান্ড' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনজনঃ সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বা 'নিউক্লিয়াস' ছিলো একটি গোপন সংগঠন। '৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির পর তাঁর সাথে 'নিউক্লিয়াস' ঘনিষ্ঠ হয়। তখন থেকে বঙ্গবন্ধু গোপনে এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায় দায়িত্ব বহন করতেন। বঙ্গবন্ধু, ছাড়াও যাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা পেয়েছিলো তাঁরা হলেন এম.এ আজিজ (চট্টগ্রাম), এম.এ হান্নান (চট্টগ্রাম), মোশাররফ হোসেন (যশোর), আবদুল হাকিম, ইউসুফ আলী (দিনাজপুর), সোহরাব হোসেন (মাগুরা) ও তাজউদ্দীন আহমদ। তবে এঁদের ভেতর তাজউদ্দীন সাহেবের সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিলো। ডাক্তার আবু হেনা (সাবেক সভাপতি, ময়মনসিংহ ছাত্রলীগ ও '৭০ সালের এমপি) বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া বিচারপতি মোঃ ইব্রাহিম, সাবেক রাষ্ট্রদূত

কামরুদ্দিন আহমেদ, চার্টার্ড একাউনটেন্ট ব্যারিস্টার আবদুল আহাদ ও প্রফেসর ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। ডা. আবু হেনা 'নিউক্লিয়াস'র বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কোলকাতায়ও গিয়েছিলেন।

প্রকাশ্যে এই 'নিউক্লিয়াস' এর কোনো কর্মকাণ্ড ছিলো না ঠিকই; কিন্তু ছাত্র আন্দোলন, ৬ দফা, ১১ দফাসহ প্রতিটি গণআন্দোলনকে স্বাধীনতার পক্ষে মতামত সৃষ্টির কাজে রূপ দিতে 'নিউক্লিয়াস' এর ছাত্র-যুব নেতৃত্ব গুরুদায়িত্ব পালন করে। আমরাই '৬৪ থেকে '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্র-যুবকদের সুসংগঠিত করে সশস্ত্র গেরিলা ট্রেনিং ও অস্ত্র সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করি। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট- বি.এল.এফ.'কে কার্যকর করি। বি.এল.এফ. সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে 'মুজিব বাহিনী' নামেও পরিচিত ছিলো। ভারতের দেরাদুনের 'টান্ডোয়া'য় ও 'কালসী'তে এবং মেঘালয়ের 'হাফলং'য়ে সর্বমোট সাত (৭) হাজার শিক্ষিত ছাত্র-যুবক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলো। বাংলাদেশকে চার সেক্টরে ভাগ করে চারজন প্রধান ও চারজন সহকারীর নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করি। জেনারেল সুজন সিং ওবান-এর নেতৃত্বে 'বি.এল.এফ' সদস্যদের একাংশ নিয়ে 'মাউন্টেন বাহিনী' নামে আরো একটি 'বিশেষ বাহিনী' গঠন করা হয়।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের শিক্ষা আন্দোলনের পর নভেম্বর মাসে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও আমি ঐক্যমতে পৌঁছাই যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের একটি প্রগতিশীল সংগঠনে রূপান্তর করবো। স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কর্মী সৃষ্টি করে বাংলা ভাষা, বাঙালি ও বাংলাদেশের ন্যায়সংগত দাবি দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তর করবো। এ জন্য আমরা মিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট 'পাকিস্তান' এবং তথাকথিত 'পাকিস্তান জাতি' সৃষ্টির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুদূর প্রসারি আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালির জাতিসত্তার উন্মেষের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের মধ্যে বক্তব্য ও প্রচারধর্মী আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের গতির সাথে সম্পর্ক রেখে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনা অনুসারে 'নিউক্লিয়াস' '৬৮ সাল নাগাদ গোটা বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনশত (৩০০) ইউনিট/ফোরাম গঠন

করতে সক্ষম হই। প্রতিটি ইউনিটে সাত/নয় (৭/৯) জন করে সদস্য ছিলো। প্রতিটি মহকুমার অধীন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ সদস্য নিয়ে গোপন কমিটি বা ফোরাম গঠিত হতো। '৬৮-'৭০-এ 'নিউক্লিয়াস' এর সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭ (সাত) হাজারে দাঁড়ায়।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে 'জনযুদ্ধে'র মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা।

ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা নির্ভীক, সৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রবান কর্মীদের মধ্য থেকে বিপ্লবী পরিষদের 'প্রাথমিক সদস্য' সংগ্রহ করা হতো।

মিথ্যা বলা, অর্পিত কাজে অবহেলা করা, নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব না দেওয়া, সংগঠনের গোপন তথ্য প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ধরা হতো। মিথ্যা বলা, গোপন তথ্য প্রকাশ করার ও বিশ্বাস ঘাতকতার সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিলো। কর্মীদের সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া হতো। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য 'শিক্ষা ফেরাম' গঠন করা হয়।

১৯৬৬ সালের কোনো এক সময় আরো দু'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে 'নিউক্লিয়াস'কে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়। তাদের একজন আবুল কালাম আজাদ (অধ্যাপক ও এককালে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি), অপরজন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি)। পরে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার দায়ে আবুল কালাম আজাদকে 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যপদ এবং বিপ্লবী পরিষদের সাধারণ সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আর কাজের ধীরগতি ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপের ফলে মান্নান সাহেব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ১৯৬৮ সালে 'নিউক্লিয়াস' আবার আগের মতো তিন সদস্য বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রথম দু'টি বৈঠক হয় যথাক্রমে পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামের ভলিবল খেলার মাঠের গ্যালারিতে এবং ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) লন টেনিস কোর্টে। এখানে বসেই ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বা 'নিউক্লিয়াস' গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। তবে সাধারণত: মধুর কেন্টিন, নীলক্ষেতের আবদুল কাদের-এর আনোয়ারা রেস্টুরেন্ট, মেডিকেল হোস্টেলের নিকটস্থ পপুলার-হাসিনা-কাফে কাশ রেস্টুরেন্ট, সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে

(তোপখানা রোড) গুলনার ও ইসমত রেস্টুরেন্ট, সদরঘাটের রুচিতা হোটেল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্সানউল্লাহ হল, ইকবাল হলের কেন্টিন, টেনিস কোর্ট ও মাঠ, এস এম হল, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এবং ক্যান্টিন, রেসকোর্স, কালীবাড়ি মন্দির, আউটার স্টেডিয়াম, রমনা পার্ক, ধূপখোলা মাঠ (গেন্ডারিয়া), দয়াগঞ্জ পুরাতন রেলসেতুর অপর পাড়, মিরপুরের বাগান বাড়ি এবং টিকাটুলীতে আমার (কাজী আরেফ) পৈত্রিক বাড়িতে 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠকদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো।

আমরা মূলত: ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ থেকেই কর্মী সংগ্রহ করতাম। '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর পরই আমরা দেশের প্রতিটি জেলায় (তৎকালীন জেলা ও মহাকুমা) একটি করে 'জেলা ফোরাম' গঠন করি। প্রতি জেলা ফোরামের একজন নেতার উপর সেই ফোরামের দায়িত্ব ছিলো। সে নেতাই কেন্দ্রীয় ফোরামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আমার দায়িত্ব ছিলো কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলা ফোরামের। আবদুর রাজ্জাকের দায়িত্ব ছিলো ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও ফরিদপুর। সিরাজুল আলম খান দেখতেন ঢাকা, খুলনা, পাবনা ও সিলেট। এছাড়াও সিরাজ ভাইয়ের নিয়ন্ত্রণে স্বতন্ত্রব্যক্তিকে বিপ্লবী পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হতো। সিরাজ ভাই ও রাজ্জাক ভাই যৌথভাবেই নেতা ও সদস্যদের বিপ্লবী পরিষদ সদস্য সংগ্রহ করতেন। 'নিউক্লিয়াস'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিপ্লবী পরিষদের সদস্যপদ চূড়ান্ত হতো। যে কোনো সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের চূড়ান্ত অধিকারী ছিলো 'নিউক্লিয়াস'। এছাড়াও সিরাজুল আলম খানের তত্ত্বাবধানে মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি), আ স ম আবদুর রব, সাজাহান সিরাজ, স্বপন কুমার চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ), আমিনুল হক বাদশা ও এডভোকেট চিত্তরঞ্জন গুহ, নূরে আলম জিকু-এর মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করা হতো।

বিপ্লবী পরিষদে দু'ধরনের সদস্য সংগ্রহ করা হতো। প্রথমে সবাইকে 'অস্থায়ী সদস্য' হিসেবে রিক্রুট করা হতো। পরবর্তিতে চারিত্রিক গুণাবলী, সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সংগঠনের প্রতি আস্থা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে একজন অস্থায়ী সদস্যকে 'পূর্ণাঙ্গ সদস্য' হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

১৯৬৯ সালের পর 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'-এর সদস্য হিসেবে নারী

সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চট্টগ্রামের রাশেদা (পরে বাসস এর সাংবাদিক), মমতাজ বেগম (জাসদের এককালের মহিলা সম্পাদিকা), শামসুন্নাহার ইকু, রাফিয়া আখতার ডলি, ফরিদা খানম সাকি, রাবেয়া হায়দার (সাজাহান সিরাজের স্ত্রী), ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম, আফরোজা হক রীনা, আমেনা সুলতানা বকুল, উম্মেল ওয়ারা বকুল, হোসনেয়ারা বকুল, নুর রোকসার চৌধুরী খুকু, শাহিদা খাতুন, শিরিন আখতার (সাবেক ছাত্রলীগ সভানেত্রী), লুৎফা হাসিন রোজী, নাজমা শাহীন বেবি, কাজী ফেরদৌসী হামিদ লীনু, আলো, রুবা ও নাসিরাসহ আরো অনেককে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে অস্থায়ী সদস্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যশোর জেলা ফোরামের সদস্যা ছিলেন রওশন জাহান সাথী ও সালেহা বেগম। ঢাকায় 'নিউক্লিয়াস'ভুক্ত ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন (মরহুমা) মমতাজ বেগম। আরেকজনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হবে; তাঁর নাম সাজেদা চৌধুরী (বর্তমানে ডাক্তার)। সাজেদা স্কুলে থাকাকালে তার হাতের লেখায় 'বিপ্লবী বাংলা' পত্রিকা সাইক্লোস্টাইল করে বের করা হয়। সাজেদার বড় ভাই জহুরও বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য যে এরা প্রায় সবাই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

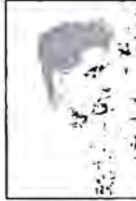
১৯৬৯ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে বেরিয়ে আসার পর 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র কর্মকাণ্ড ও সংগঠন সম্পর্কে শেখ মুজিবকে প্রাথমিকভাবে অবহিত করা হয়। ফলে 'নিউক্লিয়াস'র সাথে শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময় সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ মুজিব একই ফোরামের সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। এই ফোরামের দায়িত্ব ছিলো বৈদেশিক সাহায্য, সমর্থন, ট্রেনিং ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। '৭০ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুকে 'নিউক্লিয়াস' ও বি.এল.এফ-এর কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও বিস্তারিত কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন হন। 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'র একটি পরিকল্পিত 'গোয়েন্দা বিভাগ' ছিলো। আমি 'গোয়েন্দা বিভাগ'র প্রধান ছিলাম।

'নিউক্লিয়াস' প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যাঁরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা হলেন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মণি), নূর আলম জিকু, চিত্তরঞ্জন গুহ, সৈয়দ আহমদ, আ স ম আবদুর রব, সাজাহান সিরাজ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সুধীর কুমার হাজরা, হাসানুল হক ইনু, আ ফ ম

মাহাবুবুল হক, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মাসুদ আহমেদ রুমি, সাইফুল গণি চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমেদ বুলবুল, স্বপন কুমার চৌধুরী, ফজলে এলাহী, স্বপন আচার্য, কামরুল আলম খসরু, মোস্তফা মোহসীন মন্টু, মহিউদ্দিন, কামাল উদ্দিন ফীরু, তারন, এস এম সুলতান টিটু, শেলী, মাজহারুল হক বাকী, খালেদ মোহাম্মদ আলীসহ আরো অনেকে।


বিনয় কৃষ্ণ বসু


বাদল (সুধির) গুপ্ত


দিনেশ গুপ্ত

১৯৬৬ সাল থেকে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক, এডভোকেট কামরুদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার আব্দুল আহাদ ও ডক্টর আহমদ শরীফের সমন্বয়ে আরো একটি 'ফোরাম' গঠন করা হয়। এই ফোরাম বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়। কামরুদ্দিন সাহেব তার লেখা Social History of East Pakistan এবং Labour Movement of East Pakistan বই দু'টি বাংলা এবং ইংরেজীতে ছাপান এবং আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করেন। বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠন, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম এবং গেরিলা যুদ্ধের জ্ঞানলাভের জন্য অধ্যয়ন ও বই পড়ার উপর জোর দেয়া হতো। যেমন- মাওসেতুং, চে গুয়েভারা, জেনারেল গিয়াপ, ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল নাসুশিয়াম ও সাইপ্রাসের জনৈক জেনারেলের লেখা গেরিলা যুদ্ধের বইসমূহকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। এছাড়াও ব্রিটিশ ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনের নায়কদের জীবনী ও ঘটনাসমূহের ওপর লেখা বই পড়ার ব্যবস্থা করা হতো। যেমন- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিপ্লবী সূর্যসেনের জীবনী, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তির লেখা বই, ক্ষুদিরাম-প্রীতিলতা ও বিনয়-বাদল-দিনেশের ওপর লেখা বই এবং কর্নেল শাহনেওয়াজের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সুভাষ বসু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ। এছাড়াও রাসবিহারী বসু, সুকর্ন, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, বেনবেল্লা, লেনিন, মাওসেতুং, হো চি মিন ও চে গুয়েভারার জীবনী ও ডাইরি এবং ভিয়েতকং-এর লংমার্চ, জিজ্ঞাসা, জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে', রুশ বিপ্লব, জন রিডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন', আলজেরিয়ার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, রেজিস দেবরের 'রেভুলেশন ইন দ্যা রেভুলেশন' আর অশোক মেহতা ও লোহিয়ার

'ডেমোক্র্যাটিক স্যোশালিজম'র ওপর লিখিত বই পড়ার উপর বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হতো।

'নিউক্লিয়াস'-এর তত্ত্বাবধানে কর্মী বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি জেলা ও মহকুমা শহরে 'ফোরাম' গঠন করে প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণের জন্যই 'বিপ্লবী বাংলা' নামে হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল করা একটি গোপন পত্রিকা বের করা হতো। পত্রিকাটি শুধুমাত্র সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ফোরাম গঠন, বিপ্লবী পরিষদের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের 'উন্মেষ' ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 'বিপ্লবী বাংলা'য় প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি পর পর তিনটি কপি বের হওয়ার পর বন্ধ করে দেয়া হয়। এর পর 'জয়বাংলা' নামে একটি পত্রিকা গোপনে বের করা হয়। 'ফোরাম'র পক্ষ থেকে আবুল কালাম আজাদ (সদস্য থাকাকালে) 'সংগ্রামী বাংলা' নামে একটি বই ছাপান। বইটি পরিষদের সকল সদস্যকে পড়ার জন্য দেয়া হতো। পত্রিকা বের করার জন্য একটি সাইক্লোস্টাইল (রেক্স রটারী) মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছিলো। ২৫ মার্চের পর মেশিনটি মতিঝিল কলোনীর এক বাড়িতে আবুল কাশেমের (সাবেক ছাত্রলীগ নেতা) তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণের জন্য '৬৮ সালে আমার তত্ত্বাবধানে একটি 'ছায়া ফোরাম' গঠিত হয়। ছাত্রলীগ ফোরামে প্রথমে আমার সাথে ছিলো মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি), আ স ম আবদুর রব, সাজাহান সিরাজ ও স্বপন কুমার চৌধুরী। পরে এই ফোরামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় '৬৮ সালে মফিজুর রহমান খান (সাপ্তাহিক খবরের কাগজের প্রকাশক) ও মোস্তাফিজুর রহমান, '৬৯ সালে মাসুদ আহমেদ রুমী, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আ.ফ.ম মাহবুবুল হক এবং '৭০ সালে হাসানুল হক ইনুকে। 'নিউক্লিয়াস'-এর সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড)।

ঢাকা শহর পরিচালনার জন্য আরো একটি 'ফোরাম' গঠন করা হয়। এতে ছিলেন মফিজুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম, বদিউল আলম (দৈনিক জনতার রিপোর্টার) ও নজরুল ইসলাম (জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক)। এছাড়াও আমিনুল হক বাদশা (বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারী), বোরহানুদ্দিন খান গগন ('৭৩ সালের এম.পি.), এডভোকেট চিত্তরঞ্জন গুহ (রাজবাড়ী), রেজাউল হক মোস্তাক, চিশতি শাহ হেলালুর রহমান (দৈনিক আজাদের সাংবাদিক), মনিরুল হক চৌধুরী, কাজী ফিরোজ

রশীদ (জগন্নাথ কলেজ), বোরহান উদ্দিন পুনম, জাহিদ (ছাত্রলীগ), কাওসার, আতাউর, দেলোয়ার, গোলাম ফারুক, আবদুল বাতেন চৌধুরী, আবদুল ওয়াদুদ (এস,এম হলের ছাত্র), আবদুল্লাহ সানি (ইঞ্জিনিয়ার), সালাউদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার), হাসিব খান (স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), আজাদ (ইঞ্জিনিয়ার) ও লুৎফা হাসিন রোজী। এরা সবাই ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। আমিনুল হক বাদশা, মেসবাহ উদ্দিন (বর্তমানে অংকুর প্রকাশনীর মালিক) ও আবদুল হাইকে (বিক্রমপুর) নিয়ে 'পাঠচক্র' গড়ে তোলা হয়।

এম.এ. আজিজ

এম এ আজিজ

এম.এ. আজিজ আওয়ামী লীগের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরে যে ব্যক্তিটির কাছে আমরা ঋণী তিনি– চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. আজিজ। সিরাজুল আলম খান ও চট্টগ্রাম জেলা ফোরামের নেতা এ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী পরিষদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখায় আজিজ ভাই আমাদের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে গণ্য হন। পরে সিরাজুল আলম খান আমাকে সহ আবুল কালাম আজাদ ও এম.এ. আজিজকে নিয়ে একটি 'ফোরাম' গঠন করেন। চট্টগ্রাম জেলা ফোরামে আরো ছিলো সালেহ আহমেদ, মোক্তার আহমেদ, সাবের আহমেদ আসগারী ও এস.এম. ইউসুফ (পরে বিপ্লবী পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন)।

চট্টগ্রাম জেলা ফোরামের পাশাপাশি ছাত্রলীগ ও চট্টগ্রাম শহরে কাজ করার জন্য আমাদের দায়িত্বে আরো একটি 'ফোরাম' গঠন করা হয়। সেখানে ডাক্তার মাহফুজুর রহমান, ডাক্তার গোফরান, জাকারিয়া, আবুল কাশেম, রাখাল চন্দ্র বণিক, আহমদ শরীফ মনির, শওকত হাফিজ রুশনি, নুরুল আলম ও আবু সালেহ প্রমুখকে দিয়ে ফোরামটি চালু করা হয়।

১৯৬৮-'৬৯ সালে বিভিন্ন জেলা ফোরামের দায়িত্ব পালন করতেন: দিনাজপুরে- মাহতাব সরকার ও মো. মোকসুদুর রহমান, বগুড়ায়- মোস্তাফিজুর রহমান পটল ও এম.এ সামাদ, রংপুরে- হারেস সরকার, পাবনায়- আহমেদ রফিক ও বকুল, সিরাজগঞ্জে- নূর আলম ও আবদুল লতিফ মির্জা, রাজশাহীতে- ডাক্তার এম. এ

করিম, বরিশালে- ডেজ আই খান পান্না, খুলনায়- মনোরঞ্জন দাস, কামরুজ্জামান টুকু ও আক্তারুজ্জামান, যশোরে- আলী হোসেন মনি, কুষ্টিয়ায়- আবদুল মোমেন ও সেলিম, টাঙ্গাইলে- খন্দকার আব্দুল বাতেন, মানিকগঞ্জে- রফিকুল ইসলাম বিল্টু, নরসিংদি ও নারায়ণগঞ্জে- মফিজুর রহমান খান, ফরিদপুরে- মনোরঞ্জন সাহা, মাদারীপুরে- আমির হোসেন, সিলেটে আক্তার আহমেদ ('৮৪ সালে লন্ডনে ক্যান্সারে মারা যান), কুমিল্লায়- এডভোকেট হাবিবুল্লাহ চৌধুরী, নোয়াখালীতে- মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ও মোস্তাফিজুর রহমান প্রমূখ।

বিভিন্ন জেলায় যুব ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন: দিনাজপুরে- সিরাজুল ইসলাম, নীলফামারীতে- আনিসুল হক গামা, রংপুরে- মোস্তাফিজুর রহমান মকুল, গোবিন্দগঞ্জে- শ্যামল চাকি, গাইবান্ধায়- রুস্তম আলী, আবদুল মতিন তালুকদার, বগুড়ায়- তোফাজ্জল হোসেন, এ বি এম শাহজাহান, সিরাজুল ইসলাম সুরুজ, জুলফিকার হায়দার বুলু, মমতাজ উদ্দিন, আমানুল্লাহ খান, পাবনায়- আতাউল হক হক্কু, মো. ইকবাল, নওগাঁয়- আবুল কাশেম, নাটোরে- অনাদি, কুষ্টিয়ায়- এম এ বারি, জিয়াউল বারী নোমান, যশোরে- রবিউল আলম ও আবদুল হাই, বরিশালে- এম এ বারেক, বাগেরহাটে- সুরেন, খুলনায়- বিনয়, ঢাকায়- আবদুল আজিজ বাগমার, এবিএম আহ্‌সানউল্লাহ (ঢা.বি, এসএম হল), নারায়ণগঞ্জে- মনিরুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান খান, ঢাকার নবাবগঞ্জে- সিদ্দিক মাস্টার, মানিকগঞ্জে- বাদল, ফরিদপুরে- খোন্দকার আতাউল হক, কুমিল্লায়- নজির আহমেদ ভূঞা, চট্টগ্রামে- গোলাম চৌধুরী নাজিম (বর্তমানে লন্ডনস্থ 'বেতার বাংলা'র পরিচালক) প্রমুখ।

'নিউক্লিয়াস'-এর বহু সদস্য তখন ছাত্র-যুব-সংস্কৃতিসেবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তারা হলেন আমিনুল হক বাদশা, আল-মুজাহেদী, এনায়েতুর রহমান (ডাকসু-জিএস), নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, শাহ্ চিশ্‌তি হেলালুর রহমান, (ডক্টর) আফতাব আহমদ, কাদের মাহমুদ, শামসুজ্জামান খান, শামসুদ্দিন আহমেদ পেয়ারা, (ডক্টর) ফরাশউদ্দিন আহমেদ, (ডক্টর) বদিউল আলম মজুমদার, সা কা ম আনিছুর রহমান খান, রায়হান ফেরদৌস মধু, রেজাউল হক মোস্তাক, মোস্তাফিজুর রহমান, একরামুল হক, খালেদ মোহাম্মদ আলী, রাখাল চন্দ্র বণিক, মোশারফ হোসেন, হরমুজ আলী বি.এস.সি, খন্দকার ফারুক আহমেদ, আপেল মাহমুদ, মিলন মাহমুদ, সুমন মাহমুদ, আবদুল্লাহ সানি, শিব নারায়ণ দাস, রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড), হাবিবুর রহমান খান (নারায়ণগঞ্জ), সালাহউদ্দিন ইউসুফ, মইনুল

ইসলাম চৌধুরী আজাদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, (শহীদ) নজরুল ইসলাম জগন্নাথ কলেজ, (শহীদ) নজরুল ইসলাম (ঢাকা কলেজ), খন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, গোলাম ফারুক (হিটলার ফারুক), (শহীদ) আব্দুল ওয়াদুদ, মজিবুল হক, আগা খান মিন্টু, তৈয়বুর রহমান (মিরপুর), মোহাম্মদ উল্লাহ (আদমজী), আহমদ উল্লাহ, অজিত রায়, আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বার (কণ্ঠশিল্পী), মুরাদ (গোপীবাগ), আরিফুর রহমান রতন, ডা. নুরুল ইসলাম চঞ্চল, সেন্টু, আবদুল কাইয়ুম (খোকন), কবি শফি (নোয়াখালী), ডা. শেখ হায়দার আলী, ডা. সোলায়মান মণ্ডল, ডা. গাজী আবদুল হক, ডা. কলিমুর রহমান, নাজিমউদ্দিন আহমেদ, শিল্পী শাহাবুদ্দিন (প্যারিস প্রবাসী), শিল্পী কামাল আহমেদ (কানাডা প্রবাসী) সহ আরো অনেকে। 'নিউক্লিয়াস' ও বি.এল.এফ 'মিলিটেন্ট' গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু।

১৯৭০ সালে এসে 'নিউক্লিয়াস' এর পক্ষ থেকে সিরাজুল আলম খান-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠে সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগ। শ্রমিক লীগ '৭০ সালের ৭ জুন 'জয়বাংলা বাহিনী' ও ছাত্রলীগের সাথে কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিবাদন জানানোর মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধকে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক লীগের যেসব নেতা ফোরামর সদস্য বা 'নিউক্লিয়াসপন্থী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ শাহজাহান, সায়েদুল হক সাদু, রুহুল আমিন ভূঁইয়া, মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, শফি সর্দার, গাজী মোহাম্মদ সিরাজ, আবদুল মান্নান (ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল শ্রমিক ইউনিয়ন), আবদুল জলিল (বিআরটিসি-কল্যাণপুর), নুরুল ইসলাম (বিআরটিসি-মতিঝিল), মো. শামছুল আরিফ (টংগী), নজরুল ইসলাম (সাংবাদিক), আবদুল মান্নান (ওয়াপদা), আজিজুল হক (আদমজী), শফিউল্লাহ (তেজগাঁও), মানিক দাস গুপ্ত (বগুড়া), মকবুল (বগুড়া), হাবিব উল্লাহ বাহার (চট্টগ্রাম-সীতাকুণ্ড) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা বি.এল.এফ 'নিউক্লিয়াস'এর রাজনৈতিক শাখা। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুকে 'নিউক্লিয়াস' ও বি.এল.এফ-এর কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও বিস্তারিত কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন হন। '৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বি.এল.এফ এর 'হাইকমান্ডে' শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। তিনি এ চার যুব নেতাকে স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রয়োজনে ভারতের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।

'নিউক্লিয়াস' মিটিং এ বসে বঙ্গবন্ধুর সুপারিশ অনুযায়ী মনি ভাই ও তোফায়েল আহমেদকে বি.এল.এফ 'হাই কমান্ডে' অন্তর্ভুক্ত করে।

এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বা 'নিউক্লিয়াস'কে সারা দেশব্যাপী দাঁড় করানো হয়। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশকে মুক্ত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রস্তুতির জন্য সম্ভাব্য সকল সাহায্য-সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব 'নিউক্লিয়াস'-এর অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

দলগতভাবে আওয়ামী লীগ 'নিউক্লিয়াস' সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। জেলা পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে যাঁরা 'নিউক্লিয়াস' এর সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন তাঁরা হলেন: ঢাকায় গাজী গোলাম মোস্তফা, শাহাবুদ্দিন, নিজাম (পার্টনার), আলী হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আমেনা বেগম, ফজলুল হক বিএসসি (ঢাকা), আবদুল মোমেন (নেত্রকোনা), রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া (ময়মনসিংহ), ফরিদ গাজী (সিলেট), মো. মহসিন (খুলনা), আবদুল হাই (মুন্সিগঞ্জ), শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), মোশাররফ হোসেন (যশোর), সোহরাব হোসেন (মাগুরা), শহীদউদ্দিন ইস্কান্দার বুলু (নোয়াখালী), নূরুল হক মিয়া (নোয়াখালী), শামসুল হক (ঢাকা-গাজীপুর), আবদুল হামিদ (ঢাকা-কেরাণীগঞ্জ), ইমাম উদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর), ফণিভূষণ মজুমদার (ফরিদপুর), আবদুর রহিম সরকার (দিনাজপুর), এডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (ঠাকুরগাঁও), সালাউদ্দিন ইউসুফ (খুলনা), আবদুর রব সেরনিয়াবাত (বরিশাল), বিধানকৃষ্ণ সেন, ভূপতিভূষণ, মানিক চৌধুরী, আবদুর রহমান (শ্রমিক নেতা), গোফরান (শ্রমিক নেতা), ছোট সাদু (শ্রমিক নেতা), শফিক (শ্রমিক নেতা), সফি সরদার (শ্রমিক নেতা) প্রমুখ।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ইউপিপি'র ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম, কাজী জাফর আহমদ, আবদুল মান্নান ভুঞাসহ ভাসানী পন্থীদের অনেকের সঙ্গে; কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড ফরহাদ এবং কমরেড সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক-এর সঙ্গে; বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের শামসুদ্দোহা-এর সঙ্গে; বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার, হায়দার আকবর খান রণো ও মাহবুব উল্লাহসহ অনেকের সঙ্গে এবং শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল-এর সিদ্দিকুর রহমান, নির্মল সেন ও মাওলানা সাইদুর রহমান-এর সঙ্গে সিরাজুল

আলম খান'র সুসম্পর্ক ও নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। উপরোক্ত সংগঠন এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর পরিচালিত ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার 'এক দফা' আন্দোলনে রূপান্তরিত ও বেগবান করার ক্ষেত্রে অনেকাংশে সহায়ক হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিয়া (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এবং পল্লীকবি জসিমউদ্দিন-এর সঙ্গে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের গভীর সম্পর্ক ছিলো।

প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক-সাহিত্য রচনায় পারদর্শীদের মধ্যে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, সিরাজউদ্দীন হোসেন, আসাফউদ্দৌলা রেজা, সত্যেন সেন, আনিসুজ্জামান (সাংবাদিক), এনায়েতুল্লাহ খান (হলিডে) 'দি পিপল' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক আবিদুর রহমান, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা, সাংবাদিক এন এম হারুন, সাংবাদিক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক আবু তালেব, সাংবাদিক নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, সাংবাদিক আবদুল আওয়ালসহ (দৈনিক আজাদ) সবার সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস' এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। অনেক সাংবাদিক 'নিউক্লিয়াস' এর, গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতেন সিরাজুল আলম খান-এর কাছ থেকে। ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং ইত্তেফাকের কর্মাধ্যক্ষ এম এ ওয়াদুদ এবং আবদুল মোমিন তালুকদার এর সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস' এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। মাহবুব তালুকদার, সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহ, গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ বহু সাংবাদিক '৬৯-'৭০ গণ আন্দোলনের সময় সিরাজুল আলম খান-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েও যাঁরা ছাত্রলীগ-এর সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতেন তাঁরা হলেন- আহমদ ছফা, আসাদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, সমুদ্র গুপ্ত, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, ফকীর আলমগীর, রাহাত খানসহ বেশ কয়েকজন। চলচ্চিত্র জগতের জহির রায়হান, এহতেশাম ও সালাউদ্দিন আহমেদ 'নিউক্লিয়াস' এর সাথে জড়িত ছিলেন।

আগরতলা (ষড়যন্ত্র) মামলার অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সুলতান উদ্দিন আহমেদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন খুরশিদ, স্টুয়ার্ড মুজিবসহ ঐ মামলার প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বি.এল.এফ-এর কার্যক্রমের সমর্থক ছিলেন। কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া গ্রামের

রতন-গগন-মাখনদের বাড়িতে 'নিউক্লিয়াস-বি.এল.এফ' সশস্ত্র ট্রেনিং-এর যে ব্যবস্থা করেছিলো তার মূল দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ। '৬৯-'৭০-'৭১ 'নিউক্লিয়াস ও বি.এল.এফ' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে জনাব সাইদুর রহমান (ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী) বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। '৬৮-'৬৯-'৭০ এ আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রশ্নে ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ কর্মকাণ্ড 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্ভাব্য 'জনযুদ্ধ'র সময়ে বেতার কেন্দ্র চালু রাখার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক বিভাগের অধ্যাপক নূরুল্লাহকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সমিটারটি (Transmitter) চালু করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁর সঙ্গে সিরাজুল আলম খান-এর পক্ষ হয়ে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বে ছিলেন শরীফ নূরুল আম্বিয়া। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও এ বিষয়ে অধ্যাপক নূরুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

চট্টগ্রাম ছিলো 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সবচাইতে সুদৃঢ় ঘাঁটি। এরপরেই যশোরের অবস্থান। যশোর জেলায় ৬ দফা আন্দোলনের সময় বিরোধীরাই ছিলো শক্তিশালী। আওয়ামী লীগের মরহুম মশিউর রহমান -এর নেতৃত্বে প্রথম সারির অনেক নেতাই সে সময় বিরোধিতায় নামেন এবং পি.ডি.এমপন্থী হয়ে যান। এরা শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেন। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাত থেকে ৬ দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রলীগ কর্মী ও নেতাদের সহযোগিতা ও সমর্থন যোগাতেন তদানিন্তন যশোর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা (শহীদ) মোশাররফ হোসেন। তাঁর ছত্রছায়ায়ই 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্যরা যশোর জেলায় কাজ করতো। প্রকৃতপক্ষে যশোর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ খুবই দুর্বল ছিলো। এখানে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আবদুল হক সাহেবের সংগঠনটি ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী। '৬৯ সালে যশোরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক মিটিংয়ে তোফায়েল আহমেদের বক্তৃতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হক সাহেবের পার্টির কর্মীরা এবং মেনন গ্রুপের ছাত্ররা তোফায়েলকে ঘেরাও করে। আওয়ামী লীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যশোর জেলা বিপ্লবী পরিষদের 'জেলা ফোরাম' গঠন করতে আমি '৭০ সালের নির্বাচনের পরে যশোর যাই। সে সময় আলী হোসেন মনির তত্ত্বাবধানে 'জেলা ফোরাম' গঠন করি। 'জেলা ফোরাম'র অন্যান্য সদস্য ছিলেন আবদুস সালাম, রবিউল আলম, মশিউর

রহমান, রওশন জাহান সাথী, আবদুল হাই, আবু সাদ সন্টু, মহিউদ্দিন মইন, খয়রাত হোসেন, সালেহা বেগম ও শহীদ মাহফুজ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে যশোর ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল তোফায়েল স্থানীয় সকল আওয়ামী লীগ নেতাদের ক্যান্টমেন্টে নৈশ ভোজের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মশিউর রহমান সাহেবরা এই কালরাতের দাওয়াত রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঐদিন দুপুরে মোশাররফ হোসেন সাহেবের সাথে বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রাজ্জাকের টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। আমরা ২৫শের কালরাতের সম্ভাব্য পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণের সম্ভাবনা ও ঢাকার সর্বশেষ অবস্থার কথা তাঁকে জানাই। তাই তিনি এই ডিনারে যেতে অস্বীকার করেন এবং অন্যদেরও যেতে দেননি। গেলে অবশ্যই যশোর আওয়ামী লীগ নেতারা কর্নেল তোফায়েলের ফাঁদে পড়তেন।

চট্টগ্রাম ও যশোরের পরেই বিপ্লবী পরিষদের ঘাঁটি এলাকা ছিলো ঢাকার কালীগঞ্জ ও রূপগঞ্জ থানা। মফিজুর রহমানের দায়িত্বে হুমায়ুন, আকরাম ও আলী হোসেনকে ('৭৭ সালে আততায়ীর হাতে মারা যায়) দিয়ে 'আঞ্চলিক ফোরাম' গঠন করা হয়। এখানে আরো একজন সদস্য ছিলেন- আখতারুজ্জামান (সাবেক ডাকসু সহ-সভাপতি)। আখতার যখন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়ে তখন আমি বিপ্লবী কাজের প্রয়োজনে ঐ এলাকায় যাই। আখতারের আগ্রহের কারণেই তাকে পরবর্তীতে বিপ্লবী পরিষদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙা মহকুমায় অনুরূপ দায়িত্ব ছিলো সেলুন জোয়ারদারের উপর। ঐ অঞ্চলেরই আলমডাঙা থানায় কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়। ওখানে আমি ঐ অঞ্চলের জেলা ফোরামগুলোকে নিয়ে দু'তিনবার প্রশিক্ষণের জন্য মিলিত হই। এভাবেই দিনাজপুর-রংপুর-বগুড়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয় বগুড়ায়। দিনাজপুরের মাহতাব, রংপুরের হারেস ও বগুড়ার মোস্তাফিজুর রহমানের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। বগুড়ার একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসেবে কাজ করেন আবদুস সামাদ। খুলনার মনোরঞ্জন, সালাম, কামরুজ্জামান টুকু ও আবদুল কাইউম (খোকন) বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলো। বরিশালের দায়িত্বে ছিলো জহুরুল ইসলাম পান্না (এডভোকেট)। এখানে বিপ্লবী পরিষদের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এসব অঞ্চল ছাড়াও প্রায় প্রতিটি মহাকুমায় বিপ্লবী পরিষদের কাজ বিভিন্নভাবে অস্থায়ী সদস্যদের দিয়ে করানো হতো।

জনগণের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের বৈষম্য ও শাসন শোষণ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝানোই ছিলো অস্থায়ী সদস্যদের প্রাথমিক কাজ। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই শুধুমাত্র বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শাসন শোষণমুক্ত করা যেতে পারে; কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে তা হতে পারে না।

'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বা 'নিউক্লিয়াস' এর অস্ত্র ভাণ্ডার এবং প্রশিক্ষণস্থল হিসেবে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া গ্রামের রতন-গগন-মাখনদের বাড়ি বহু পূর্ব থেকেই 'প্রধান কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। '৬৫ সালে 'নিউক্লিয়াস' এর ৪০ জন সদস্যের বিদেশে সামরিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এই ৪০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে ইন্দোনেশিয়াতে পাঠাবার কথা ছিলো। এই ব্যবস্থা শেখ মুজিব আমাদের সদস্যদের জন্য করেছিলেন। এই ৪০ জন সদস্যকে পাঠানোর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছিলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। সুকর্নকে ক্ষমতাচ্যুত করে সুহার্তো ক্ষমতা দখল করেন। তাই ট্রেনিং-এ পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়। সম্ভবত শেখ মুজিব সেই সময় জাকার্তায় নিযুক্ত বাঙালি কূটনৈতিক শামসুর রহমান খানকে দিয়ে এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।

এ সময়ে 'পূর্ব পাকিস্তান শ্মশান কেনো'– এই নামে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য, বিভিন্ন চাকরিতে কতো কম বাঙালিদের অবস্থান এই সব বিষয় উল্লেখ করে গোটা দেশে প্রায় ত্রিশ (৩০) হাজার পোস্টার ছাপানো ও দেয়ালে লাগানো এক বিস্ময়কর আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়।

পরবর্তীকালে '৭০ সালের আগস্টের দিকে আবারো ভারতে গেরিলা ট্রেনিং এ পাঠানোর জন্য ৬০ জন বিপ্লবী পরিষদ সদস্যকে মনোনীত করা হয়। '৬৯ সালে শেখ মুজিব জেল থেকে বেরিয়েই চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। লন্ডনে এসেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নির্বাচন ও ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, অন্যথায় স্বাধীকার আন্দোলন পরিচালনার জন্য সমর্থন-সহযোগিতা ও রাজনৈতিক বন্ধু পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ফিরে এসেই বিপ্লবী পরিষদের ফোরামে ভারতে ট্রেনিং-এর জন্য কর্মী প্রস্তুত করার কথা বলেন। '৭১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ৬০ জনের ভারতে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এসময় এতো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিলো যে আমরা বাধ্য হয়ে ট্রেনিং এ যাওয়ার তারিখ পিছিয়ে

দেই। ১ মার্চ ইয়াহিয়ার ঘোষণায় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়। দেশের সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। '৭১ সালের ফেব্রুয়ারি, বি.এল.এফ-এর বার্তা নিয়ে ডাক্তার হেনা কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সূতারের সাথে দেখা করেন। শ্রী সূতার তখন শেখ মুজিবের প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। এরপর ভারত সরকার শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য যে কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনে এবং জনগণ যদি সামরিক স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে ভারত যোগ্য প্রতিবেশির ভূমিকা পালন করবে বলে জানিয়ে দেয়। আর ভারত বন্ধু হিসেবে সম্ভাব্য সকল সাহায্য সহযোগিতারও আশ্বাস দেয়।

১৯৭০ এর আগস্টে যে ট্রেনিং শুরু হওয়ার কথা ছিলো তারই সূত্র ধরে '৭১-এ 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট- বি.এল.এফ.'-কে ভারত যাবার আগেই কার্যকর করা হয়। বি.এল.এফ. 'মুজিব বাহিনী' নামেও পরিচিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মেজর জেনারেল সুজন সিং ওবান-এর সহায়তায় 'জনযুদ্ধের কৌশল' অবলম্বন করে বি.এল.এফ.সদস্যদের 'গেরিলা ট্রেনিং' দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বাংলাদেশকে চারটি সেক্টরে ভাগ করে চারজন প্রধান ও চারজন সহকারির নেতৃত্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ ও বি.এল.এফ বাহিনী পরিচালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বি.এল.এফ.-এর কমান্ড কাঠামো ছিলো নিম্নরূপ-

উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর (সাবেক রাজশাহী বিভাগ–দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা)।

প্রধান- সিরাজুল আলম খান, সহপ্রধান- মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি)। ট্রানজিট ক্যাম্প ছিলো পাঙ্গায় (ভারতের দিনাজপুরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশ সীমান্তে)।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টর (সাবেক খুলনা বিভাগ– বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া)।

প্রধান-তোফায়েল আহমদ, সহপ্রধান- কাজী আরেফ আহমেদ ও নূর আলম জিকু। ট্রানজিট ক্যাম্প ছিলো ব্যারাকপুর।

উত্তর-পূর্ব বা মধ্যাঞ্চলীয় সেক্টর (সাবেক ঢাকা বিভাগের অংশ – বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল)।

প্রধান-আবদুর রাজ্জাক, সহপ্রধান- সৈয়দ আহমদ/সাজাহান সিরাজ। ট্রানজিট ক্যাম্প ছিলো তুরায়।

পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর (সাবেক চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের অংশ – সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম)।

প্রধান- শেখ ফজলুল হক মণি, সহপ্রধান- আ.স.ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। ট্রানজিট ক্যাম্প ছিলো আগরতলায়।

ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ: যৌথভাবে চার নেতার নেতৃত্বাধীন ছিলো। কমান্ডার ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু এবং মোস্তফা মোহসিন মন্টু।

বি.এল.এফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান: কাজী আরেফ আহমেদ।

ছাত্রলীগের দায়িত্বে: নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাজাহান সিরাজ।

প্রশিক্ষণের দায়িত্বে: ভারতের উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে ভারতীয় মিলিটারী একাডেমী চাক্রাতার সন্নিকটে 'টান্ডোয়া' নামক স্থানে মূল ট্রেনিং ক্যাম্প ও মেঘালয়ের হাফলংয়ে বি.এল.এফ. বা মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং হতো। '৭১ এর মে থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৭ হাজার শিক্ষিত ছাত্র-যুবক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন হাসানুল হক ইনু, আ.ফ.ম মাহবুবুল হক, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মাসুদ আহমেদ রুমী প্রমুখ। এছাড়াও দেরাদুনের কালশীতে লিডারশীপ ট্রেনিং দেয়া হয় (৮০ জনের ব্যবস্থা থাকলেও ট্রেনিংএ ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন)। এই ট্রেনিং শিবিরেই '৭১এর অক্টোবরে বি.এল.এফ. 'মুজিব বাহিনী' হিসাবে পরিচিতি পায়। 'মাউন্টেন বাহিনী' নামে আরো একটি বিশেষ বাহিনী জেনারেল ওবান-এর নেতৃত্বে গঠন করা হয়। তারা মিজোরামের দেমাগ্রীতে অবস্থান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।

১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় হরতাল চলাকালে তিনটি ফাঁড়ি ও দু'টি বন্দুকের দোকান লুট হয়। জনতা প্রায় ২০টি ৩০৩ রাইফেল ও ২টি ২২ বোরের রাইফেল নিয়ে বিরাট মিছিল সহকারে ইকবাল হলে আসে। ওগুলো সংগ্রহ করে রাতেই সান্ধ্য আইন চলাকালে সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই ও আমি ঢাকা বোর্ড অফিসের পেছনে এক বাড়িতে রাখি। '৭১ সালের ২৩ মার্চ সকালে পল্টন ময়দানে 'জয়বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজ ও বাংলাদেশের মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সময় কামরুল আলম খান খসরু ৭ এমএম রাইফেল থেকে গুলির শব্দে 'নতুন পতাকা'কে স্বাগত জানানো

হয়। ঐ রাইফেলগুলোই ২৫ মার্চ দুপুরে আ স ম আবদুর রবের সাথে বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে রতন-গগনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাই 'নিউক্লিয়াস'-এর/বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলো। ছাত্রলীগের এই অংশই তখন থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে 'র‍্যাডিক্যাল গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত হয়। '৬৮ সাল থেকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা অতি সহজে সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হতো। যেমন তোফায়েলকে সভাপতি নির্বাচিত করার কারণে নূরে আলম সিদ্দিকী চরম বিরোধীতা করেন। তিনি বক্তৃতা-বিবৃতি ও ছাত্রসভা করে বেড়ান এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের জেলা শাখাগুলোকে তোফায়েল-রবের নেতৃত্ব বিরোধী করে তোলেন। পার্টি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেদিন নূরে আলম সিদ্দিকীকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু শেখ মুজিব এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। আরো একটি ঘটনা আছে। জগন্নাথ কলেজের এমএ রেজাকে শেখ মুজিবের নিষেধ সত্ত্বেও সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্বাধীন 'বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' আগের থেকেও অনেক শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়।

'ছয় দফা' দেয়ার পর শেখ মুজিব জেলে গেলে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা ৬ দফার বিরোধীতা করে পি.ডি.এমপন্থী (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) হয়ে যায়। তখন এম.এ. আজিজ 'ছয় দফা'র পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সে সময় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন আমেনা বেগম। এদের দুর্বল ও অনভিজ্ঞ নেতৃত্বের কারণে তখনকার আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ৬ দফাপন্থীদের খুবই নাজুক অবস্থা ছিলো।

ছাত্রলীগ কর্মী ও নেতাদের চাপে এবং এম.এ. আজিজের বলিষ্ঠ ভূমিকায় আওয়ামী লীগের জেলা নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ছয় দফাপন্থী' আওয়ামী লীগের অবস্থাকে সুসংহত করেন। আওয়ামী লীগ থেকে কিছু সংখ্যক জনবিচ্ছিন্ন নেতারা বেরিয়ে গিয়ে 'পি.ডি.এমপন্থী' আওয়ামী লীগের জন্ম দেন।

'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরাই এই দুর্দিনে চিরতরে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে যাবার অবস্থা থেকে রক্ষা করে। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সদস্য না হয়েও সিরাজুল আলম খানই আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে রাখেন।

ঠিক এমনি অবস্থায় '৬৯ সালের 'গোলটেবিল' বৈঠকে শেখ মুজিবকে জেল থেকে প্যারোলে বের করে অংশগ্রহণ করানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজিজ ভাই

প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। বিপ্লবী পরিষদের চট্টগ্রাম জেলা ফোরাম আজিজ ভাইয়ের নেতৃত্বে সমগ্র চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং প্যারোলে বেরিয়ে শেখ মুজিব যাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেন তা বন্ধের ব্যবস্থা করেন।



বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

একদিন জানা গেল শেখ মুজিব প্যারোলে বের হচ্ছেন। তখন আজিজ ভাই, জানে আলম সাহেবের বাড়ি হতে টেলিফোনে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের সাথে কথা বলে জানিয়ে দেন, 'মুজিব প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে গেলে আমাকে আপনারা আওয়ামী লীগে পাবেন না।' এ কথাটা যেন শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেয়া হয় সে অনুরোধও করেন। অনুরূপভাবে সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম রব বেগম মুজিবের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে একই ধরনের কথা জানিয়ে দেন। এমনিভাবে ছাত্রলীগ ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র কর্মীরা মিছিল সহকারে ৩২ নং ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাসভবনে যায়। তাদের স্লোগান ছিলো: 'গোলটেবিল না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ; গোলটেবিলে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; শহীদের রক্ত মাড়িয়ে, গোলটেবিলে যাওয়া চলবে না, চলবে না' প্রভৃতি। ছাত্ররা জেল গেটের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নেতৃত্বে প্যারোলে মুক্ত শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে পাঠাবার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে বেগম মুজিবের অবদান অসামান্য। বেগম মুজিব জেল গেটে দেখা করে মুজিবকে প্যারোলে বের হলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী এবং এম. এ. আজিজের প্রতিক্রিয়া জানান। এর সাথে সাথে বেগম মুজিব তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনকে শুধুমাত্র ৬ ও ১১ দফার প্রতি 'ম্যান্ডেট' হিসবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। '৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র যদি পশ্চিমারা মেনে না নেয় তবে একদফা কায়েম করে প্রয়োজনে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে', সেদিন এই বক্তব্য

সরাসরিভাবে দেয়া হয়। বিপ্লবী পরিষদের সকল কর্মীকে '৭০ সালের নির্বাচনে মাঠে নামতে নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশ ও পরিষদ সদস্যদের স্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার জন্য 'জয়বাংলা' নামের সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা বের করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল আমাদের কাছে এমন কোনো অস্বাভাবিক মনে হয়নি। 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ' সদস্যরা সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য। জাতীয় পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ থেকে ১৬২ জনের মধ্যে ১৬০ জনই নির্বাচিত হন। ৭ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৬৭ জন সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে ৩০০ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের মধ্যে ২৮৯ জন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। অন্যান্য দল থেকে মাত্র ৪ জন নির্বাচিত হয়েছিলো। স্বতন্ত্র ছিলেন ৪ জন। নির্বাচনের এই ফলাফল যেমনভাবে বাঙালিকে উৎসাহিত ও আশান্বিত করেছিলো তেমনিভাবে আতঙ্কিত করেছিলো পাকিস্তানি সামরিক বেসামরিক আমলাগোষ্ঠী আর পাকিস্তানি ব্যবসায়ী শিল্পপতি মহলকে। আতঙ্কিত হয়েছিলেন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরাও। নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার সময় 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ' সদস্যের গুরুত্ব ছিলো। কারণ আওয়ামী লীগ তখনো এতো দুর্বল যে 'নিউক্লিয়াস'-'বি.এল.এফ' ছাড়া মনোনয়ন দেয়ার মতো লোকও তাদের ছিলো না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য এবং বাংলাদেশকে শোষণের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। এই সময় '৬ ও ১১ দফা ভিত্তিক দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা' স্লোগানটি কর্মীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'র পরিবর্তে 'জয়বাংলা' স্লোগান সর্বত্র ধ্বনিত হতে থাকে। এসময় বিপ্লবী পরিষদ 'জয়বাংলা' নামের একটি সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা বের করে। এই পত্রিকায় নির্বাচনে 'বিপ্লবী পরিষদ' কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্বাচনের ফলাফলের সাথে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সফলতার ভাগ্য জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন তৎকালীন প্রচার সম্পাদক স্বপন কুমার চৌধুরী ('৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে নিখোঁজ/শহীদ হন)। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তখন সদস্য সংখ্যা ছিলো ৪৫ জন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর এই প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবের

বিপক্ষে ছাত্রলীগের ৮ জন *(শেখ সেলিম, শেখ শহিদ, সৈয়দ রেজাউর রহমান, শফিউল আলম প্রধান, এম এ রশিদ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, মনিরুল হক চৌধুরী, ওবায়দুল মোকতাদির)* প্রভাবশালী সদস্য ভোট দেয়। আবদুর রাজ্জাকের মারফত শেখ মুজিব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমাদের কাছে খবর পাঠান। প্রস্তাব গ্রহণের সময় তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ বিপক্ষের ৮ জন অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব শেখ মুজিব ও আবদুর রাজ্জাকের অনুরোধে সংশোধন করতে হয়। শেষ পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলাদেশ' গঠন করার প্রস্তাব নেয়া হয়। অবশ্য সেদিনের বিপক্ষে ভোটদানকারী সদস্যরা প্রকৃতই স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এমনটা বলা যায় না। ছাত্রলীগের ভেতর অবস্থিত দু'টি পরস্পরবিরোধী গ্রুপের কারণেই হয়তো তারা বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই আটজনের ভেতর সাতজনকেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অংশগ্রহণ করতে দেখি।

১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমাকে একটি 'পতাকা'র ধারণা করতে বলা হয়। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' নামের একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন করার এবং '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'-এর একটি ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ তৈরি করার। আমার পরিকল্পনা ছিলো '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনীর' এর জন্য যে ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ তৈরি করা হবে সেটাকে জাতীয় পতাকার সম্মান দেয়ার। কিন্তু রাজ্জাক ভাই বিষয়টি আরো গভীর ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। তাই সেদিন মেরুন ও হলুদ রঙের ব্যানারে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তাতে 'জয়বাংলা' ও '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' লিখে মিছিলের সামনে বহন করা হয়। প্রত্যেক কর্মীর হাতের ব্যান্ড মেরুন ও হলুদ রঙের এবং এর মাঝে লেখা ছিলো '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী'। গলায় মেরুন ও হলুদ রঙের স্কার্ফ। এই বাহিনী আজিমপুর গোরস্থানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরের মাজারে অভিবাদন ও পুষ্পমাল্য দিয়ে শহর প্রদক্ষিণে বের হয়। মিছিলের প্রথমে ছিলেন সাবেক ঢাকা শহর সভাপতি মফিজুর রহমান খান। এরপর ছিলেন হাসানুল হক ইনু, মনিরুল হক চৌধুরী (পরে বিএনপির এমপি), মনিরুল হক (সভাপতি, ঢাকা শহর ছাত্রলীগ) ও শেখ হাসিনা (বর্তমান সভানেত্রী, আওয়ামী লীগ)। প্রত্যেককেই সাদা

প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরতে হয়েছিলো। মেয়েরা সাদা শাড়ি পরে মিছিলে যোগ দিয়েছিলো। এই মিছিলে তোফায়েল আহমেদ, আ স ম রব ও সাজাহান সিরাজ সামনের সারিতে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ জুন শ্রমিক জোটের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবকে অভিবাদন দেয়ার কর্মসূচি নেয়া হয়। ঐদিন ছাত্রলীগও সিদ্ধান্ত নেয় যে একটা 'বাহিনী গঠন' করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। এবারো 'নিউক্লিয়াস'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এই বাহিনীর নাম দেয়া হয় 'জয়বাংলা বাহিনী'। অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হয় আ স ম আবদুর রবকে। 'নিউক্লিয়াস' থেকে বাহিনীর পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পতাকা বঙ্গবন্ধুকে 'ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ' হিসেবে প্রদান করা হবে। ৬ জুন '৭০ সালে ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর রুমে মনিরুল ইসলাম, সাজাহান সিরাজ ও আ স ম আবদুর রবকে ডেকে আমি 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্ল্যাগ তৈরির কথা জানাই। এই ফ্ল্যাগ পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানাই। তখন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) ও আ স ম আবদুর রব বলেন যে এই পতাকার জমিন অবশ্যই বটলগ্রিন হতে হবে। সাজাহান সিরাজ বলেন যে লাল রঙের একটা কিছু পতাকায় থাকতে হবে। এরপর আমি পতাকার নকশা তৈরি করি– বটলগ্রিন জমিনের উপর প্রভাতের লাল সূর্যের অবস্থান। সবাই একমত হন। তারপর পতাকার এই নকশা 'নিউক্লিয়াস' হাইকমাণ্ডের অনুমোদন নেয়া হয়।

তখন আমি প্রস্তাব করি যে, এই পতাকাকে পাকিস্তানি প্রতারণা থেকে বাঁচাতে হলে লাল সূর্যের মাঝে সোনালী রঙের মানচিত্র দেয়া উচিত। কারণ হিসেবে দেখালাম যে, প্রায়ই বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'ভারতের হাত আছে' বা 'ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ হচ্ছে' অথবা 'ভারতীয় এজেন্টদের কার্যকলাপ' বলে প্রচারণা চালায়। তাছাড়া এই সময় 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ বেঙ্গল' বা 'বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র' নামের কাল্পনিক একটি দেশের জন্ম দেয়া হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ পূর্ব পাকিস্তান ও মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যসহ এই কল্পিত 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ বেঙ্গল' এর মানচিত্র তৈরি করে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তা বিলি করতো। এই ধরনের প্রচারণা থেকে পতাকাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সোনালী আঁশ ও পাকা ধানের

রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র পতাকার লাল সূর্যের মাঝে রাখার আমার এই প্রস্তাবে সবাই একমত হন। 'নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পতাকা তৈরি'র এই সব কাজ করা হয়।

পতাকার কাপড় কিনে তৈরি করতে পাঠানো হয় কামরুল আলম খান খসরু, স্বপন কুমার চৌধুরী, মনিরুল হক, হাসানুল হক ইনু ও শহীদ নজরুল ইসলামকে। এরা নিউমার্কেটের অ্যাপোলো নামক দোকান থেকে গাঢ় সবুজ ও লাল রঙের লেডি হ্যামিলটন কাপড় কিনে বলাকা বিল্ডিংয়ের পাক ফ্যাশন থেকে তৈরি করায়। যে দর্জি এই পতাকা তৈরি করেন তিনি ছিলেন অবাঙালি এবং ইতিবৃত্ত না জেনেই এই পতাকা তৈরি করেছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর ঐ দর্জি পাকিস্তানে চলে যান।

সমস্যায় পড়লাম মাঝের সোনালী মানচিত্র আঁকা নিয়ে। এই সময় কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাশ (বিপ্লবী পরিষদের সদস্য) ইকবাল হলে এসে উপস্থিত হন। তিনি জানালেন মানচিত্রের ওপর শুধু রং করতে পারবেন, মানচিত্র আঁকতে পারবেন না। তখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাসানুল হক ইনু ও ইউসুফ সালাউদ্দীন আহমদ চলে গেলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এনামুল হকের ৪০৮ নং কক্ষে। তাঁর কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হলো বাংলাদেশের মানচিত্র। সোনালী রং কিনে আনা হলো। শিব নারায়ণ দাশ ট্রেসিং পেপার থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে লাল বৃত্তের মাঝে আঁকলেন মানচিত্র। মানচিত্রের ওপর দিলেন সোনালী রঙ। শিবুর কাজ শেষ হওয়ার মধ্যদিয়েই একটা ভবিষ্যতের নতুন দেশের 'নতুন পতাকা'র জন্ম হলো।

রাতেই এই পতাকার সার্বিক অনুমোদনের জন্য 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠক হয় ইকবাল হলের ১১৬ নাম্বার কক্ষে। বৈঠকে পতাকাটি অনুমোদিত হলো। এবার বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনের কাজটি বাকি থাকলো। রাজ্জাক ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে অনুমোদন আদায় করার। রাজ্জাক ভাই সেই রাতেই (৬ জুন) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুমোদন গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তবে তাঁকে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

পরদিন ৭ জুন ভোর থেকেই মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। বাংলাদেশের 'প্রথম পতাকা' পলিথিনের কাগজে মুড়িয়ে আমি পল্টন ময়দানে গেলাম। কর্দমাক্ত পল্টন ময়দানে যথাসময়ে 'জয়বাংলা বাহিনী' এগিয়ে আসলো। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় বটলগ্রিন ও লাল কাপড়ের লম্বা ক্যাপ ও হাতে লাল-সবুজ কাপড়ের ব্যান্ডে লেখা 'জয়বাংলা বাহিনী'। ডায়াসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দাঁড়িয়ে;

সাথে আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমেদ। তাঁর ডান পাশে আমি পলিথিনে মোড়ানো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আ স ম আবদুর রব ডায়াসের সামনে এসে অভিবাদন দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে 'ব্যাটালিয়ান পতাকা' নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে পতাকা নিয়ে খোলা অবস্থায় উপস্থিত জনতাকে দেখিয়ে রবের হাতে তুলে দেন। রব এই 'ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ' সামরিক কায়দায় গ্রহণ করে। পরে মার্চ করে এগিয়ে যায়। 'জয়বাংলা বাহিনী' বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ 'পতাকা' নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে ইকবাল হলে ফেরত যায়।

পতাকাটি তৎকালীন ঢাকা শহর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেনের কাছে রক্ষিত ছিলো। পরবর্তিতে ২ মার্চ '৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় লক্ষাধিক লোকের সামনে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'র সভায় আ স ম আবদুর রব কলাভবনের পশ্চিম প্রান্তের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পতাকাটি প্রদর্শন করেন। এই পতাকাই পরদিন (৩ মার্চ) পল্টন ময়দানে সাজাহান সিরাজের 'স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ'-এর জনসভায় উত্তোলন করা হয়। ঐ মঞ্চে বঙ্গবন্ধুও উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে 'জয়বাংলা' বাহিনী আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যায়। ঐদিন জয়বাংলা বাহিনীকে ৪টি প্লাটুনে ভাগ করে ৪ জন প্লাটুন কমান্ডারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সেদিন জয়বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, কামালউদ্দিন (পরে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অফিসার) ও মনিরুল হক (ঢাকা শহর ছাত্রলীগ সভাপতি)। পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে কামরুল আলম খান খসরুর হাতের ৭ এমএম রাইফেল থেকে ফাঁকা গুলি করে শব্দ করা হয়। খসরুর পাশে হাসানুল হক ইনু পাতকাটি হাতে নিয়ে উর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এখান থেকেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা শেখ মুজিবের ৩২ নাম্বার ধানমণ্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়। তাঁর বাসায় ও গাড়িতে দু'টি পতাকা ওড়ানো হয়। এই 'পতাকা'ই স্বাধীন বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' অনুমোদন করেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পতাকার লাল বৃত্তের ভেতরের বাংলাদেশের সোনালী রঙের মানচিত্র উঠিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের সময় তিনি বিখ্যাত শিল্পী

কামরুল হাসান সাহেবের পরামর্শ নেন। আজ একটি ভুল ইতিহাস দাঁড় করাবার প্রবণতা চলছে। পতাকার নক্সাকারক হিসেবে কামরুল হাসান সাহেবের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই সত্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে ভুল তথ্য সাময়িক জায়গা পেলেও কালের স্রোতে তা ধুয়ে মুছে হারিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত: বলে রাখা প্রয়োজন যে, সে সময় যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সিদ্ধান্তের অনুমোদন সিরাজুল আলম খানকেই দিতে হতো।

১৯৭০ এর নির্বাচন

গণআন্দোলনের দুর্বার স্রোত সামরিক শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে জেনারেল ইয়াহিয়াকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলো। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। সেদিন থেকে শুরু হলো নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্ব। বামপন্থী ছাত্ররা মধ্যরাতে মশাল শোভাযাত্রা করে 'লাল বিপ্লব'র পক্ষে স্লোগান তুলে নতুন বছরকে স্বাগত জানালো। পরদিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জনসভা করে ঘোষণা করলো, 'ছয় দফা এবং এগারো দফাই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ'। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো– যেগুলো দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিকদলসমূহের যেমন, জামায়াতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে বলে পরিচিত, সেগুলো তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্যে কিছুই করলো না। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর রাজনৈতিকদলসমূহ যেমন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি), পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ (পিএনএল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (জেইউআই) এবং বিভক্ত মুসলিম লীগের একটি অংশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করলো। কিন্তু পেশী প্রদর্শনের প্রচেষ্টা তাদের ভেতরকার দুর্বলতাকেই প্রকট করে তুললো। তারা আকর্ষণীয় কিছুই করতে পারলো না।

ইতোমধ্যে তিনটি রাজনৈতিক দল: আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফরপন্থী) ও জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নামলো। আওয়ামী লীগ ১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভা করে। এই সভাতে সিরাজুল আলম খান কৌশলে 'জয়বাংলা' স্লোগানকে নিজে ঘোষণা করেন এবং জনগণের সমর্থন আদায় করেন।

সবদিক দিয়েই ১১ জানুয়ারির আওয়ামী লীগের সভাটি ছিলো দেখার মতো এবং সুসংগঠিত। সমাবেশের ধরণও ছিলো বেশ চমৎকার। সাংবাদিকতার ভাষায়–

এটা ছিলো একটা 'বিশাল' জনসভা। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রথম নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিলেন। বললেন, 'বাঙালিরা '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নিয়ে ভুল করেছে। আজো যদি কেউ একে বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো তাহলে তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতেন। এই সভাতেই প্রথমবারের মতো সিরাজুল আলম খান 'জয়বাংলা' স্লোগান নিজ মুখে উচ্চারণ করেন। এই 'জয়বাংলা' স্লোগানই বাঙালির পরিচয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

পরের রোববার (১৮ জানুয়ারি) একই ময়দানে জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রথম নির্বাচনী জনসভা করলো। জামায়াত এ সভার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে সফল করে তোলার যাবতীয় চেষ্টা করলো; কিন্তু চোখের পলকে এ সভাটি একটি হাতাহাতির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। পঞ্চাশজনের মতো আহত হলো। আহতদের মাঝে পঁচিশ জনের অবস্থা গুরুতর ছিলো। পার্টির আমীর মাওলানা আবুল আলা মওদুদী শুধু জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য লাহোর থেকে উড়ে এসেছিলেন; ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাকে মাঠ ত্যাগ করতে হলো। এই খণ্ডযুদ্ধের পর থেকে জামায়াত একটি ক্ষুব্ধ ও অক্ষম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভুত হলো।

একজন সিনিয়র মার্শাল ল' অফিসার 'জনসভায় জামায়াতকে সরকারি ছত্রছায়া দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু জামায়াতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাকে জামায়াতের তরফ থেকে বলা হয়েছিলো, 'আমরা সবকিছুর ব্যবস্থা রেখেছি'। অফিসারের ধারণা হলো, জামায়াত প্রমাণ করতে চাইছে যে, যদি আওয়ামী লীগ কোনো সাহায্য ছাড়াই সাফল্যজনকভাবে সভা করতে পারে তা হলে তারা কেনো পারবে না? তাদের মতে, একটি দুর্বল দলই সরকারি ছত্রছায়া কামনা করে। এ বিষয়টি জামায়াত-ঘেঁষা একজন সাংবাদিকের কাছে উত্থাপন করলে তিনি বললেন, 'না, জামায়াত ছত্রছায়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়নি। সরকার বেড়ার উপর বসেছিলো তার দল নিরপেক্ষ চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে'।' (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-২১-২২)

১৭ জানুয়ারি 'নিউক্লিয়াস'-এর পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, জামায়াতের আমির মাওলানা মওদুদীর ১৮ জানুয়ারি ঢাকার পল্টনের জনসভা করতে দেবো না। জনসভার মঞ্চ প্রায় দশ ফুট উঁচু এবং বিরাট আকারের ছিলো। মঞ্চের নীচে তারা কয়েক হাজার তিন ফুটের গজারীর লাঠি লুকিয়ে রেখেছিলো। এক পর্যায়ে জামায়াতের জনৈক বক্তা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে

অশালীন ভাষায় বক্তব্য রাখলে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী-সংগঠকরা তার প্রতিবাদ করে। পরে তা হাতাহাতি ও মারামারিতে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে গুলিস্তান এলাকার সাধারণ হকার, হোটেলের কর্মচারী ও ফকিরাপুলের স্থানীয় লোকেরা জামায়াতের কর্মীদের আক্রমণ করে। প্রথমে জামায়াত খুব সুশৃঙ্খলভাবে তা প্রতিহত করে। তাদের একজন নায়েব মঞ্চের মাইক থেকে বলতে থাকে, 'বদর বাহিনী' পূর্ব দিক থেকে, 'সালেহিন বাহিনী' পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করুন। এমনিভাবে আরো অনেক বাহিনীর নাম উচ্চারণ করেছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জনতার প্রচণ্ড আক্রমণে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। মিটিং পণ্ড হয়ে যায়। এতে জামায়াত কর্মী ও পথচারীসহ প্রায় ৫০০ জন আহত হয়। ২৫ জানুয়ারি ডাকসু ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টনে বিরাট জনসমাবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়, 'নির্বাচন বানচালের যে কোনো চক্রান্ত এদেশের সংগ্রামী জনতা প্রতিহত করবে'।

'তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কৃষক সমাবেশ। (৪ ফেব্রুয়ারি) শুরু হলো নানান রণভেরী নিনাদের মধ্যদিয়ে। যদিও এ কৃষক সমাবেশ সংগঠিত করেছিলো ন্যাপ (ভাসানী); কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হলো সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা সকল দলকে। টাঙ্গাইলে যাওয়ার জন্য সরকারই বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। সমাবেশ যাতে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলো। গভর্নর হাউজের কিছু রাজনৈতিক পেঁচক চাইছিলেন ন্যাপকে (ভাসানী) আওয়ামী লীগের সমান শক্তিধর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে'।

'কোনো বিরোধী গ্রুপ সমাবেশে ক্ষতিকর কিছু করলো না। কিন্তু তাদের ভেতরকার বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে সমাবেশটি ভেঙে পড়লো। এ সমাবেশ কিছু বিপ্লবী স্লোগানের জন্ম দিলো। যেমন, 'রক্ত না আগুন– আগুন আগুন'; 'ব্যালট না বুলেট– বুলেট বুলেট'।

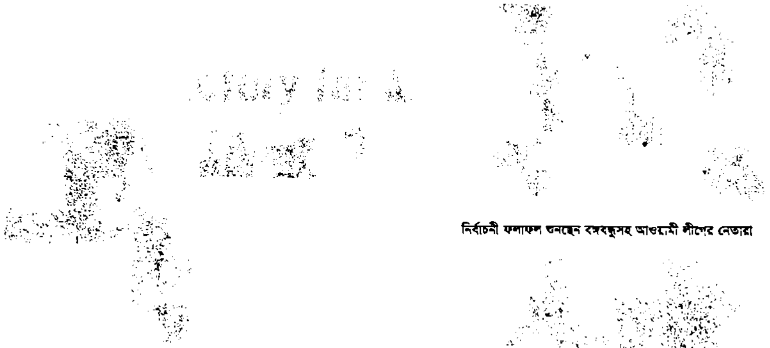
'অতি-বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ন্যাপের জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ তোয়াহা। তিনি নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিরোধিতা করলেন প্রচণ্ডভাবে এ যুক্তিতে যে, এতে সরকারের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আসবে না। তোয়াহা বিশ্বাস করতেন, সমগ্র পাকিস্তানে একই সঙ্গে লাল বিপ্লবের মাধ্যমেই সত্যিকারের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।'

'আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল ছিলো– যেমন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান

ন্যাশনাল লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ। এ গ্রুপগুলো থেকে মাত্র একটি কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিলো। কণ্ঠস্বরটি ছিলো পিডিপি'র প্রধান মি. নূরুল আমীনের। তিনি নিজে ছিলেন অসুস্থ। সংযম, সহনশীলতা এবং ন্যায্য আচরণের কথা তিনি বললেন। কিন্তু যেখানে ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের দাবিসমূহ প্রচণ্ড নির্ঘোষে নিনাদিত হচ্ছে; সেখানে তার অসুস্থ কণ্ঠস্বর খুবই দুর্বল ও বেসুরো ঠেকলো। আসলে রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিলো। এ প্রবণতাকে ঠেকাবে কে? যাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিলো বলে ধরা হতো– তারা এ সম্পর্কে হয় জ্ঞাত ছিলেন না, নতুবা ইচ্ছে করেই এ ব্যাপারে নিজেদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বধির করে রেখেছিলেন।' ঐ পৃ.২২

'এ ছাড়া দুই অংশের ঐক্যের উপর জোর সৃষ্টিকারি যে কোনো অনুভূতিশীল পদক্ষেপের উপর আওয়ামী লীগ আঘাত হানতে শুরু করলো। জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জানুয়ারির জনসভাকে পণ্ড করা হয়েছিলো। কেননা, ওই সভাতে দুই অংশের বন্ধনের প্রশ্নে ইসলামী ঐক্যের উপর জোর দেয়া হয়েছিলো। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বাকি সময়টুকুতেও আওয়ামী লীগ তার এই কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটালো। দলটি একইভাবে পয়লা ফেব্রুয়ারিতে পিডিপি'র ঢাকার জনসভা, ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের জনসভা ও সৈয়দপুরে ৭ মার্চের জনসভা পণ্ড করে দিলো। কুমিল্লায় ১০ মার্চের কনভেনশন মুসলিম লীগের সভা, বরিশালের ১৫ মার্চ এবং ঢাকার ১২ মার্চের জনসভা নষ্ট করে দেয়া হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত আরো কয়েকটি জনসভা পণ্ড করে দেয়া হলো। এ কাজগুলো 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর সদস্যরাই ঘটালো।'

'শেখ মুজিবের প্রতিপক্ষ– যেমন ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, নূরুল আমিন, প্রফেসর গোলাম আযম এবং মৌলভী ফরিদ আহমেদ প্রমুখের কেউই জনতার মঞ্চে থাকা শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার রাজনৈতিক শক্তি ফিরে পেলেন না। পল্টন ময়দানে তার মতো একই নিনাদে গর্জন করে উঠতে পারতেন সেই বয়োবৃদ্ধ ভাসানী। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি আন্দোলনের ধারাকে বজায় রাখায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি জনতার সামনে গর্জন করে অবসর নিতেন নিজ ঘরে এবং ইচ্ছামতো নিজের মতের পরিবর্তন ঘটাতেন। তিনি প্রথমে পয়লা আগস্টে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিলেন। যখন পয়লা আগস্ট এলো তখন স্থগিত রাখলেন। পিছিয়ে দিলেন ৮



নির্বাচনী ফলাফল শুনছেন বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের নেতারা

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০ এবং মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। ফলে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাকিস্তান শাসনের অধিকার লাভ করে। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী সমর্থিত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনযন্ত্র আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিপক্ষে ছিলো।

নির্যাতিতদের শোকর আনায়

সেপ্টেম্বর, তারপরে ১ অক্টোবরে এবং অবশেষে কিছুই ঘটলো না। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি তাঁর প্রভাব হারালেন।' (ঐ, পৃ.৩১)

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের মধ্য সময় পর্যন্ত শেখ মুজিব রাজশাহী, টাঙ্গাইল, সিলেট, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ, রংপুর এবং দিনাজপুরের বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দান করেন। এসব তার নির্বাচনী প্রচার অভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে 'স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে '৬ দফা' ভিত্তিক অধিকার অর্জনের স্বপক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এই শক্তি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমবেত শক্তি– এই শক্তি গণতান্ত্রিক চেতনার এক জাগ্রত শক্তি। 'নিউক্লিয়াস'-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ সম্পাদন হতো। ৭ ডিসেম্বর '৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার সংখ্যা ছিলো পূর্ব বাংলায় ৩,১২,১১,২২০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২,৫৭,৩০,২৮০। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এতোবড় পরাজয় সহ্য করতে না পেরে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। পাকিস্তানি সামরিক

জান্তার এই চক্রান্তকে প্রতিহত করতে বাংলার মানুষ উপনিবেশবাদ ও সামরিক জান্তা বিরোধী আন্দোলনে নামে।

এই নির্বাচন ছিলো 'নিউক্লিয়াস'-'বি.এল.এফ'-এর জন্য অগ্নিপরীক্ষা। এই নির্বাচনে জিতেই রাস্তার গণ-আন্দোলনকে 'জনগণের ম্যান্ডেট' হিসেবে গণ্য করা হলো। 'নিউক্লিয়াস' সারা দেশে তার ৭ (সাত) হাজার সদস্যকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করলো।

'নিউক্লিয়াস' সদস্যের জন্য এ নির্বাচন যে কোনো সশস্ত্র যুদ্ধের চাইতে অধিক শক্তি সৃষ্টির কৌশল। সেভাবেই নির্বাচনে বিজয়তো হলোই, স্বাধীনতার বিষয়টিও জনগণের সামনে তুলে ধরা হলো।

'৭১ এর অগ্নিঝরা মার্চ

১৯৭১ এর অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিনেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেলা একটা চার মিনিটে এক আকস্মিক ঘোষণায় ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্ট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অবশ্য এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টায় মুজিবকে গভর্নর হাউজে ডেকে আনা হয়। বড়-সড় ভূমিকা করে গভর্নর এডমিরাল আহসান তাঁকে প্রেসিডেন্টের ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানান। আশ্চর্যজনকভাবে মুজিব শান্ত থাকলেন। মিষ্টি ভাষায় তিনি তার যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং বললেন, 'এ নিয়ে আমি কোনো ঘটনা সৃষ্টি করবো না যদি আমাকে নতুন কোনো তারিখ দেয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারবো। আর এপ্রিলে হলে আমার পক্ষে কষ্টকর হবে।' (নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৬)

সেখান থেকে চলে আসার সময় মুজিব মেজর জেনারেল ফরমানকে বললেন, 'আমার অবস্থা, দু'পাশে আগুন–মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেনো আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসবো।' (ঐ, পৃষ্ঠা-৫৬)

শেখ মুজিব ঐ রাতেই আওয়ামী লীগের হার্ডকোর নেতৃবৃন্দ ও 'নিউক্লিয়াস'র ('৬২ সাল থেকে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন সংগঠন) তিন নেতাসহ যুব নেতৃবৃন্দ (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ



আহমেদ ও তোফায়েল আহমেদ), চার ছাত্র নেতা (ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক সাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন) এবং আদমজী, ডেমরা, তেজগাঁ ও পোস্তগোলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় অধিবেশন বন্ধের পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে তিনি শেখ মনি ও তোফায়েলকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কাজ করতে বলেন। সিরাজ ভাই ও রাজ্জাক ভাই একমত হলে তিনি শেখ মনি ও তোফায়েলকে ডেকে নেন। আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য পাকিস্তানি সামরিক শক্তির মোকাবেলার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি জঙ্গি কর্মীবাহিনী তৈরি করে লড়াইয়ের উপযুক্ত ছাত্র-যুবশক্তি গড়ার দায়িত্ব দিয়ে বলেন, 'লড়াই ছাড়া পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালিকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।' এভাবেই বি.এল.এফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স ও তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চার যুবনেতা বা 'মুজিব বাহিনী'র চার প্রধান দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এভাবেই গড়ে ওঠে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা 'বি.এল.এফ' যা যুদ্ধকালীন সময়ে 'মুজিব বাহিনী'।

২১ জানুয়ারি '৭১ শেখ মুজিব চার যুবনেতাদের বলেন, 'আমি না থাকলেও তাজউদ্দীনকে নিয়ে তোমরা সব ব্যবস্থা করো। তোমাদের জন্য অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে।' ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি চার নেতাকে বলেন, 'তোমরা চারজন সশস্ত্র যুবশক্তিকে পরিচালনা করবে। তাজউদ্দীন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব নেবে।' তিনি 'বিপ্লবী সরকার' গঠনের কথা বার বার বলে দেন। মুজিব ভাইয়ের নির্দেশ ছিলো তাজউদ্দীন ভাই, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে একসাথে ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করার। একইভাবে ২২ ফেব্রুয়ারি '৭১ সিরাজুল আলম খান, শেখ মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েলকে এবং ৪ রাজনৈতিক নেতাকে কলকাতার একটি ঠিকানা দিয়ে বলেন, 'এ ঠিকানায় গেলেই তোমরা অস্ত্র, ট্রেনিং ও অন্যান্য সাহায্য

সহযোগিতা ও 'প্রবাসী সরকার' গঠনের সকল সাহায্য পাবে।'

পূর্ব প্রস্তুতির জন্য বঙ্গবন্ধু হোটেল পূর্বাণীতে পহেলা মার্চ দুপুর তিনটায় সর্বশেষ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে মিলিত হন। জেনারেল ইয়াহিয়ার অধিবেশন স্থগিতের মধ্যদিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ইচ্ছার নগ্ন বহি:প্রকাশ ঘটে। বাঙালির হাতে পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে না দেয়ার ষড়যন্ত্র জনগণের চোখে ধরা পড়ে। সে কারণেই ইয়াহিয়ার ঘোষণার আধ ঘন্টার মধ্যেই বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে। উত্তপ্ত ঢাকা শহরের পাড়া-মহল্লা থেকে মানুষের ঢল নামে। বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও গজারীর লাঠি হাতে ঢাকা শহর 'মিছিলের শহরে' পরিণত হয়। সেক্রেটারিয়েট থেকে সরকারি কর্মচারি, কল-কারখানার শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ ক্রোধাগ্নিতে ফেটে পড়ে পুরো ঢাকা শহরে। ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানরত পাকিস্তানি জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা পণ্ড করে ছাত্র, যুবক ও দর্শকরা। জনতার ক্রুদ্ধরোষ থেকে সেনাবাহিনী তাদেরকে রক্ষা করে। সেদিন সে মুহূর্তে, হোটেল পূর্বাণীর সামনে জনতার স্রোত জড়ো হয়। শেখ মুজিব বৈঠক থেকে বেরিয়ে উপস্থিত জনতার সামনে এসে বলেন, 'ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা ও পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিন'। বঙ্গবন্ধু বৈঠক সমাপ্ত করে হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত দু:খজনক এবং তিনি এটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেবেন না। আমরা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং সাত কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আমি চরম মূল্য দিতেও প্রস্তুত। ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতাল পরবর্তীতে ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় আমি চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবো।'

বঙ্গবন্ধু হোটেল পূর্বাণীতে পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক করছিলেন। সিরাজুল আলম খান 'ল্যামব্রেটা' মোটর সাইকেলে চড়ে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে কাকরাইল হয়ে হোটেল পূর্বাণীতে আসছিলেন। পথে মোহাম্মদ সাজাহান (শ্রমিক নেতা ও বি.এল.এফ নেতা) ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে আসছিলেন। সিরাজ ভাই সাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার আগে রাজ্জাক ভাই ও আমাকে 'মেসেজ' পাঠালেন। সিরাজ ভাই নিজেই মিছিলের কাছে গিয়ে সাজাহান ভাইকে ইশারায় জানিয়ে দিলেন যে স্লোগান হতে হবে স্বাধীনতামুখী। সেখান থেকে আসার সময় তিনি আ.স.ম. আবদুর রবকেও একই 'মেসেজ' দিলেন। অনুরূপ নির্দেশনা ঢাকা শহরের 'নিউক্লিয়াস' সদস্যদেরকেও

বিদ্যুৎগতিতে জানিয়ে দেয়া হলো। সন্ধ্যার দিকেই আমরা 'নিউক্লিয়াস'-এর মিটিং করে 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নিই। সে রাতেই সিরাজ ভাই-রাজ্জাক ভাই, আ স ম আবদুর রব এবং আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর (পরে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নামকরণ হয়) ছাত্র-গণজমায়েতে 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করতে হবে। সেই নির্দেশানুসারে পরদিন ২ মার্চ কলাভবনে সমাবেশে আ স ম আবদুর রব পতাকা উত্তোলন করেন।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র জনতার সভায় লক্ষাধিক মানুষের মহাসমুদ্রে কলাভবনের পশ্চিমের গাড়ি বারান্দাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর (সিরাজুল আলম খান'র পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয়) চার নেতা সভা শুরু করেন। এমন সময় তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ), ইকবাল (সার্জেন্ট জহুরুল হক) হল থেকে প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলাদেশের পাতাকাসহ মিছিল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হন। তার কাছ থেকে ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ঐ পতাকা হাতে নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এই পতাকাই আজ হতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা'। প্রদর্শনের সময় লাখো জনতা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে 'নতুন পতাকা'কে স্বাগত জানায়।

অন্যদিকে, এদিন পূর্ব বাংলার গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহ্সান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াকুব খান গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বেতারে সকাল ৭ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি ঘোষণা করা হয়। সাথে সাথে ছাত্র-জনতা-শ্রমিক-কর্মচারি ও খেটে খাওয়া গরীব মানুষ কারফিউ ভেঙ্গে মিছিল বের করে। স্লোগান ওঠে, 'সান্ধ্য আইন মানিনা-মানিনা'।

জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ এবং স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার প্রণয়ন

২ মার্চের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম দিক-নির্দেশনা। এর পরের প্রধান কাজটি ছিলো 'স্বাধীনতার ইশতেহার' প্রণয়ন এবং 'জাতীয় সঙ্গীত' নির্ধারণ করা। এ জন্য হাতে ছিলো মাত্র কয়েক ঘন্টা। কারণ পরদিন ৩ মার্চ পল্টনে নির্ধারিত জনসভা। ২ মার্চ রাতেই ইকবাল হলে 'নিউক্লিয়াস' বৈঠক করে। 'নিউক্লিয়াস' বসে সিদ্ধান্ত নেয় কি কি বিষয় নিয়ে ইশ্‌তেহার রচিত হবে। ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি থাকবে মর্মে 'নিউক্লিয়াস' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা;

খ. পশ্চিম পাকিস্তানকে, বিশেষ করে, সামরিক শাসক এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা;

গ. জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা;

ঘ. ইতোপূর্বে নক্সায়িত এবং প্রদর্শিত/প্রকাশিত পূর্ব-বাংলার মানচিত্রসহ তৈরি করা পতাকা স্থায়ীভাবে 'বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা;

ঙ. বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মর্যাদা দেয়া এবং ঘোষণা দেয়া;

চ. স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাট-বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র ও শিল্পকারখানায় 'নিউক্লিয়াস'/'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'/ 'বি.এল.এফ'/ এর কমিটি বা 'সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা;

ছ. 'অসহযোগ আন্দোলন'কে পুরোপুরি সফল করার জন্য সক্রিয় হওয়া। সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ছাত্র-যুব ব্রিগেড, নারী ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড ও কৃষক ব্রিগেড গঠন করা।

জ. ইতোমধ্যে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'/'বি.এল.এফ'/'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ (সাত) হাজার। এদেরকে বিভিন্ন স্কোয়াডে বিভক্ত করে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid), বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রাথমিকভাবে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া;

ঝ. স্থানীয় পুলিশ, আনসার বাহিনী, ইউওটিসি, প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনা ও ই.পি.আর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা;

ঞ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যেকোনো হামলার মুখে শহর এলাকা ছেড়ে গ্রাম এলাকায় আশ্রয় নেয়া এবং স্বাধীনতার পক্ষে সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া;

ট. ইশ্‌তেহারে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'জয়বাংলা' সহ কি কি শ্লোগান ব্যবহৃত হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়;

ঠ. বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে সকল কাজ সুসম্পন্ন করা।

'স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার' প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করার জন্য সিরাজুল আলম খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজ শুরু হয় তোফায়েল আহমেদের রুমে। যে কোনো সময় যে কোনো কাজে প্রয়োজন হলে যেনো আমাদের দু'জনকে পাওয়া যায়, সে জন্য রাজ্জাক ভাই ও আমি পাশের রুমে অপেক্ষমান

থাকবো বলে সিদ্ধান্ত হয়। সিরাজ ভাই, তোফায়েল আহমেদ ও ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুর রউফকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। তোফায়েল আহমেদ কিছুক্ষণ থেকে 'সিরাজ ভাই যা বলেন তাই হবে' বলে আরেকটি জরুরি কাজে চলে যান।

ইতোপূর্বে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ, ঢাকার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্র, নজরুল, ডি এল রায় প্রমুখের লেখা বেশ ক'টি দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হতো। এগুলোর মধ্য থেকে তিনটি প্রাথমিক বিবেচনায় আসলোঃ 'আমার সোনার বাংলা...', 'ধনে ধান্য পুষ্প ভরা...' এবং 'চল্ চল্ চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো। নজরুলের 'চল্ চল্ চল্', তারুণ্যদীপ্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ক হলেও জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না বলে প্রথমেই বাদ দেয়া হলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা...' গানটির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বেশি আবেদনময়, সর্বজনগ্রাহ্য বলে মনে হলো। সিরাজ ভাই সিদ্ধান্ত দিলেন, 'আমার সোনার বাংলা'ই হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। রাজ্জাক ভাই ও আমি পাশের কক্ষে বসে পরের দিন অর্থাৎ ৩ মার্চের পল্টনের জনসভায় জনসাধারণের সমাগমের জন্য ঢাকা শহরে 'নিউক্লিয়াস' ও বি.এল.এফ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম। সিরাজ ভাই দ্রুততা ও ব্যস্ততার সঙ্গে এসে 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। আমরা 'নিউক্লিয়াস'-এর তিনজনই একমত হই।

এর পর সিরাজ ভাই ও আবদুর রউফ প্রায় ৩ ঘন্টা সময় নিয়ে ইশ্‌তেহারের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। এই তিন ঘন্টার মধ্যে সিরাজ ভাই আমাদের দু'বার ডেকে পাঠান এবং কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মতামত নেন। অনেক কাঁটা-ছেঁড়া, গুরুত্ব অনুসারে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন, ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্ত খসড়াটি নিয়ে সিরাজ ভাই পাশের রুমে আমাদের সঙ্গে বসে 'নিউক্লিয়াস'-এর বৈঠকে সর্বশেষ অনুমোদন নেন।

রাতের মধ্যেই ইশ্‌তেহারটি প্রচারপত্র আকারে ছাপানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভোর হওয়ার আগেই পাঁচ হাজার কপি ছাপা হয়ে আসে। প্রচারপত্রটির শিরোনাম ছিলো 'স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার : জয়বাংলা'। পরদিন ৩ তারিখে পল্টন

ময়দানে বিকেল ৩ টার ছাত্র-জনসভায় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সাজাহান সিরাজকে 'স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার' ঘোষণা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। সেই বিকেলে পল্টনে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় সে তাই করলো। তার পড়া শেষে বঙ্গবন্ধু পল্টনে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হলেন। এটি ছিলো তাঁর অনির্ধারিত উপস্থিতি। তাই বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে সাজাহান সিরাজ ইশ্‌তেহারটি আবার পড়ে শোনালেন।

স্বাধীনতার ইশ্‌তেহারের বিবরণ নিম্নরূপ-

স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার : জয়বাংলা

* স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো।

* গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতনে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ 'স্বাধীন জাতি' হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশি পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

* ৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে-অঞ্চলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে-

ক. প্রতিটি গ্রাম, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন

করতে হবে।

খ. সকল শ্রেণির জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

গ. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে ও এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

ঘ. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

ঙ. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ

অ. বর্তমান সরকারকে বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশি সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনি বিবেচনা করতে হবে।
আ. তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহক পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশি ও হানাদার শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

ই. বর্তমান বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

ঈ. স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণরত যে কোনো শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

উ. বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

ঊ. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' সঙ্গীতটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ঋ. শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক 'অসহযোগ আন্দোলন' গড়ে তুলতে হবে।

এ. উপনিবেশবাদী 'পাকিস্তানি পতাকা' পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

ঐ. স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা



৩ মার্চ ১৯৭১। পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভা। এ সভায় 'স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার' পাঠ, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং 'জয়বাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক'।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে।

জয়বাংলা -বাংলাদেশের জাতীয় শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' -দীর্ঘজীবী হউক।

স্বাধীন করো স্বাধীন করো -বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

স্বাধীন বাংলার মহান নেতা -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ো -মুক্তি বাহিনী গঠন করো।

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো -বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

মুক্তি যদি পেতে চাও -বাঙালিরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালির জয় হোক।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। সভায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে পরিবেশিত হয়। উক্ত সভায়ও ঐ পতাকাটি স্বাধীন বাংলাদেশের 'জাতীয় পতাকা' হিসেবে উত্তোলিত ছিলো। সভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সরকারকে কেউ খাজনা-ট্যাক্স দিবেন না। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের সাহায্য কামনা করছি। সাত কোটি বাঙালির প্রাণের দাবিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।' সেদিন পল্টনের জনসভায় 'স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার : জয়বাংলা' শীর্ষক

একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা, একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু, ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েমের অঙ্গীকার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রব্য বর্জন, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি, 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

৩ মার্চ চট্টগ্রামে এম.ভি.সোয়াত জাহাজ থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ নামানোর সময় জনতার সাথে সৈনিক ও নাবিকদের সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়। ঢাকায় জনগণ কারফিউ ভাঙ্গে। 'জয়বাংলা' ও 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো' শ্লোগানে রাতের নিরবতা ভঙ্গ করে এবং রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। কারফিউ ভেঙে বিরাট এক মিছিল গভর্নর হাউজের দিকে এগিয়ে গেলে সেখানে গুলিতে ২ জন নিহত এবং ৬৮ জন আহত হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, '৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় হরতাল পালন করুন...'।

৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক বার্তায় ১ থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'যে কোনো মূল্যে অধিকার আদায়ে জনতাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হরতাল জনিত পরিস্থিতিতে যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে মাসিক বেতন হয়নি, সেসব অফিসগুলো শুধুমাত্র বেতন দেয়ার জন্য প্রতিদিন বেলা ২.৩০মিঃ থেকে বিকাল ৪.৩০মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙ্গাবার উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর জন্য নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।' সেদিন সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিলো।

৫ মার্চ টঙ্গীর জনতা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধে নামে। সেতু পুড়িয়ে, রাস্তার পাশে বড় বড় গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সৈনিকদের গুলিতে সেদিন অন্তত ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বহু জনতা আহত হয়। একইদিন চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিতে ২৩৮ জন নিহত হয়। সেদিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব বাংলায় গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় আসেন। একইদিন খুলনা ও রাজশাহীতেও নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালানো হয়।

৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র

ও সরকার প্রধানদের নিকট আবেদন করেন। ৬ মার্চও সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে ৩৪১ জন কারাবন্দি পালিয়ে যায়। .... ইয়াহিয়া বেতার ভাষণে বাংলার জনগণকে দুষ্কৃতিকারী বলে দোষারোপ করেন। ২৫ মার্চ পার্লামেন্ট অধিবেশনের আহ্বান করে বাংলার মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করেন।

ছাত্রলীগ ও ডাকসু ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রেডিওতে প্রচারের দাবি জানায়। এদিন ছিলো ৫ দিনব্যাপী হরতালের শেষ দিন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ মার্চ টেলিফোনে শেখ মুজিবের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে বলেন, এমন পদক্ষেপ যেনো তিনি না নেন– যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় আর না থাকে। ... ইয়াহিয়া টেলিপ্রিন্টারে একটা বার্তা প্রেরণ করেন: 'অনুগ্রহ করে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শীঘ্রই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে– যা আপনাকে আপনার 'ছয় দফা' থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সর্নিবন্ধ অনুরোধ করছি কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।' (ঐ, পৃষ্ঠা-৬৪)

এটিও ছিলো বাংলার মানুষকে বোকা বানিয়ে, বিভ্রান্তিতে ফেলে বাঙালির আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার একটি অপপ্রয়াস মাত্র। ঐ রাতেই '... জিওসির বাড়িতে...তাঁকে রাত দু'টোয় ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার। তার সঙ্গে ছিলো আওয়ামী লীগের দু'জন প্রতিনিধি (আমার মনে হয় স্বঘোষিত...)। মুজিবের দূতরা বললেন, শেখ সাহেব চরমপন্থীদের তরফ থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারা (চরমপন্থীরা) তাঁকে (শেখ মুজিবকে) এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তিও তাঁর নেই। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁকে সামরিক হেফাজতে নিয়ে আসা হোক। জিওসি তার উত্তরে বলেন, 'আমি নিশ্চিত, কিভাবে চাপ প্রতিহত করতে হয়, মুজিবের মতো একজন জনপ্রিয় নেতা তা ভালো ভাবেই জানেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না'।

আওয়ামী লীগের এই অর্বাচীন দুই নেতা স্বেচ্ছায় দালালি করায় জিওসি হুমকি দেয়ার মতো সুযোগ পায়। তিনি বলেন, 'তাঁকে বলবেন, চরমপন্থীদের আক্রোশ থেকে তাঁকে (মুজিবকে) রক্ষা করার জন্য আমি সেখানেই (রমনা রেসকোর্সে)

থাকবো। কিন্তু এও বলে দেবেন যে, তিনি যদি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন, তা হলে আমি সম্ভাব্য সব কিছুই জড়ো করবো। বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান– সব। প্রয়োজন হলে ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। তখন শাসন করার জন্য কেউ থাকবেনা, কিংবা শাসিত হবার জন্যও কিছু থাকবে না।'(ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫)

সেই চরম কঠিন দিন ৭ মার্চ– যেদিন রেসকোর্স ময়দানে মুজিব জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন– এগিয়ে এলো। ঢাকা অস্থির হয়ে উঠলো। গুজব ডালপালা বিস্তার করলো। ভয়-ভীতি এবং সংশয় দানা বাঁধলো। ব্যাপকভাবে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের জন্য একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন।' পার্টির ভিতরকার চরমপন্থীরা তখনও ঐ ঘোষণা দেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু মধ্যপন্থীরা এর বিরোধিতা করছিলো। মুজিবের অবস্থা ছিলো, দোদুল্যমান এবং তিনি চরম পদক্ষেপ গ্রহণে খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিমাপ করছিলেন।' সেদিন সত্যিই শেখ মুজিবকে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। একদিকে 'নিউক্লিয়াস'-এর নেতৃবৃন্দ, স্বাধীনবাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের '৪ (চার) খলিফা' ও ছাত্র সমাজ অন্যদিকে আওয়ামী নেতৃত্বের আপোষকামী অংশের বিভিন্নমুখি চাপ সহ্য করতে হয়েছিলো।

মার্চের ৩ তারিখ রাত ১১/১২ টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'বি.এল.এফ'-এর চার নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগের একটি 'হাইকমান্ড' গঠনের প্রস্তাব দেন 'বি.এল.এফ'-এর চার ছাত্র নেতা। বঙ্গবন্ধু বললেন, তিনি নিজেও এই রকমই ভেবেছেন।

মার্চের ৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু 'বি.এল.এফ'র চার নেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদকে ডেকে আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠন করা হয়েছে। 'হাইকমান্ডে' অন্য যাঁরা সদস্য হয়েছেন তাঁরা হলেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু প্রতি রাতেই আন্দোলনের সকল বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড'র চার নেতা এবং 'বি.এল.এফ'র চার নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসতেন।

৫ মার্চ তারিখে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে প্রথমে 'বি.এল.এফ'র হাইকমান্ড সিরাজুল আলম খানসহ চার নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা হয়। ঐ দিনই তিনি আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড'র সাথে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে 'বি.এল.এফ'র প্রস্তাবসমূহ তাদেরকে অবহিত করেন।

বঙ্গবন্ধু ৫ মার্চ পৃথকভাবে পুনরায় 'বিএলএফ'-এর 'হাইকমান্ড'র সাথে ভাষণের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেদিন অধিক রাতে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। তা হলো ভাষণটি খুবই আবেগময়ী হতে হবে এবং মূল ভাষণটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যা পরের দিন ৬ মার্চ আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড'র কাছে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেন। আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড'র নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন এবং সেই সাথে 'অসহযোগ আন্দোলন' অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অসহযোগ আন্দোলন ছাড়াও মূল ভাষণটিকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হয় তা হলো-

ক. অতীত ইতিহাস (সংক্ষেপে)।

খ. নির্বাচনের 'ম্যান্ডেট' অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

গ. নতুবা 'অসহযোগ আন্দোলন'র পাশাপাশি স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

৫ মার্চের গভীর রাতে 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ড বঙ্গবন্ধুকে যে তিন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তৃতা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় তা হলো-

* সংক্ষেপে অতীত ইতিহাসের বর্ণনা করা।
* 'অসহযোগ আন্দোলন' অব্যাহতভাবে পরিচালনা করা।
* স্বাধীনতার আহ্বান উল্লেখ করে বক্তৃতা শেষ করা।

বঙ্গবন্ধু ৬ মার্চ সকাল থেকেই 'বি.এল.এফ' ও আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড'র নেতৃবৃন্দের সাথে বার বার বৈঠক করেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড 'মুক্তির সংগ্রাম' শব্দটি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার কথা বলেছে। তখন 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ড নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবেই বলেন, 'মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম' বক্তৃতার এক লাইনে থাকতে হবে এবং সেই লাইন দিয়েই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তখন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড'র কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। ৬ তারিখ বিকাল নাগাদ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এইভাবে বক্তৃতার লাইনটি ঘোষণা দেয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড' একমত হয়েছে বলে

বঙ্গবন্ধু 'বি.এল.এফ' নেতৃবৃন্দকে জানালেন।

উল্লেখ্য, ৪, ৫ এবং ৬ মার্চ প্রতি ২/৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড' ও 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ড'র সাথে পৃথক-পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি সভার প্রসঙ্গ থাকতো ৭ মার্চের বক্তৃতার বিষয়াদি। তবে ৬ মার্চ সন্ধ্যায় 'বি.এল.এফ' বঙ্গবন্ধুকে বলেন, উক্ত লাইনটি ঘুরিয়ে বলতে হবে-অর্থাৎ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এর কিছুক্ষণ পরে 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ডকে বঙ্গবন্ধু জানালেন যে, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ডের এই প্রস্তাবে একমত আছে। তখন 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ড ৭ মার্চের বক্তৃতার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পয়েন্টগুলো লিখে দেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর বঙ্গবন্ধু 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ডকে শোনালেন তিনি কিভাবে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। ৬ মার্চ রাত ১২ টায় বি.এল.এফ 'হাইকমান্ড'র সাথে বঙ্গবন্ধুর পুনরায় আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু আবারো বক্তৃতাটি আওড়ালেন এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে শেষ করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন-কেমন হলো?

আলোচনার এই পর্বে 'বি.এল.এফ' হাইকমান্ড খুব সূক্ষ্ম একটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরলেন। তা হলো-'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' বলার পর জনসভা থেকে যে মুহুর্মুহু করতালি ও গর্জন উঠবে সেই শব্দে ঐ লাইনের শেষ অংশ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভালোভাবে শোনা যাবে না। সে কারণে জনতার গর্জন শেষ হওয়ার পর পুনরায় বঙ্গবন্ধু যেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উল্লেখ করেন এবং 'জয়বাংলা' বলে বক্তৃতা শেষ করেন।

বিষয়টি তুচ্ছ বলে মনে হলেও সে সময়ের জন্য এই লাইনটি ছিলো 'ঐশী' বাণীর মতো। এখনো ঐ অসম্পাদিত (ভাষণ) বক্তৃতায় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' দু'বার শোনা যায় এবং ঠিকই প্রথমবার জনতার জয়ধ্বনির কারণে ঐ লাইনের শেষাংশটি আড়ালে পড়ে গিয়েছিলো। পুনরাবৃত্তি করার কারণে বক্তৃতাটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা যখন মাঠে-ময়দানে বাজানো হয়, তখন দ্বিতীয়বারের কথাটি শোনা যায়। প্রথমবারের কথাটি সম্পাদনা করে দেয়া হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশ-এর আর্কাইভে তাঁর অসম্পাদিত বক্তৃতাটি এখনো সংরক্ষিত আছে।

মধ্যরাতের এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বললেন, প্রথমবার ঐ ঘটনা ঘটলে তাকে যেন কোনো না কোনোভাবে মঞ্চ থেকেই মনে করে দেয়া হয়। তাঁর সেই কথার প্রসঙ্গ ধরে আ স ম আবদুর রবকে বঙ্গবন্ধুর জামা-পাজামায় একটু টান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

৭ মার্চ, রোববার, '৭১ সাল। বাঙালির জাতীয় জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। ভোর না হতেই সারাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকার দিকে আসতে থাকে। দুপুর নাগাদ প্রায় দশ লক্ষ জনস্রোত মিলিত হয় রেসকোর্সে। বাঙালি জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। তারা তাদের জাতীয় নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আপোষহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুখ থেকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ শোনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এসেছে। এই সেই রেসকোর্স যেখানে মুজিব ভাইকে ৮ মে '৬৬ থেকে জেল জীবন পেরিয়ে, আগরতলা মামলার এক নাম্বার অভিযুক্ত হয়ে, বন্দিদশায় একজন অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে হারিয়ে, '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সবাইকে নিয়ে মুক্তি পাওয়ার পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার প্রতীক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে ছাত্র সমাজ। সেই রেসকোর্স ময়দান ৭ মার্চ ('৭১ সালে) বাঙালির বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। গণজাগরণ আর বিপ্লবের দৃঢ় শপথে উজ্জীবিত জনতা এ জন্যই যেনো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে যে, দেশ স্বাধীন না করে এবং অবাঙালি শাসকদের বাংলা ছাড়া না করে ও 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' বাংলাদেশ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরবে না। তাই সবার কণ্ঠে শ্লোগান ছিলো 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো– বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জাগো জাগো– বাঙালি জাগো', 'তোমার নেতা, আমার নেতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, শেখ মুজিব' এবং 'খুনি ইয়াহিয়ার ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই'। লাখো মানুষের মুখে স্লোগান আর হাতে শোভা পাচ্ছিলো নতুন জাতীয় পতাকা যার গাঢ় সবুজ জমিনের মাঝখানে লাল প্রভাত সূর্য এবং তারই মাঝে সোনালী রংয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা। অপেক্ষমান লাখো জনতা প্রহর গুনছিলেন কখন তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠবেন। সকাল থেকেই ঢাকায় খবর রটেছিলো, 'উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শতাধিক কমাণ্ডো প্রস্তুত রাখা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য।' আরো রটেছিলো, 'জঙ্গি জেট আর বোমারু বিমানগুলো প্রস্তুত করা আছে; বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেই রেসকোর্সের জনতার উপর বোমা ও এয়ার স্ট্রাইপিং

করা হবে (যেভাবে পাকিস্তানি বর্বর পশুরা একসময় বেলুচিস্তানের জনগণের উপর বোমা মেরে ধ্বংস করেছিলো)।'



সেদিন বঙ্গবন্ধুকে রেসকোর্সে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়েছিলো আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক ও বিশেষ বাহিনীর উপর। বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে এসে পৌছতে প্রায় এক ঘন্টা দেরি করেন। এই দেরি দেখে সিরাজুল আলম খান নিজে তাঁর মটর সাইকেল চালিয়ে শেখ মুজিবকে escort (নিরাপত্তা দিয়ে সসম্মানে) করে জনসভায় নিয়ে আসেন। দশ লক্ষ জঙ্গি লড়াকু মানুষের সামনে জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলে মুহুর্মুহু স্লোগানে জনসমুদ্র ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করতে থাকে। স্লোগানের হুঙ্কার ও অগ্নিশপথে অনুপ্রাণিত জাগ্রত বীর বাঙালি তার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে।

তিনি ১৭ মিনিটের বক্তৃতায় বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় শোষণ, বঞ্চনা ও লুন্ঠনের ইতিবৃত্ত এবং '৭০ এর নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলি ও '৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা টেনে বলেন, '...আপনি প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন, আমার গরীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমার মায়ের কোল কিভাবে খালি করা হয়েছে।... বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো– যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো–পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই বক্তব্যের দিকনির্দেশনা ছিলো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। সমগ্র জাতিকে আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত করেছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাঙালি জাতিকে রক্তের সাগর পাড়ি দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলো যার ফলে আমাদের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিয়েছিলো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র ছাত্র, যুবক ও তরুণ-তরুণীদের মাঝে

সীমাবদ্ধ ছিলো না। কিংবা সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকের সামরিক বিদ্রোহ ছিলো না। কবি সাহিত্যিকের লেখা বা কবিতা এবং গায়কের গানের সীমায় আবদ্ধ ছিলো না। সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জনসভায় ঘোষণা করেন: (১) সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে (২) জনতার উপর গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে; (৩) পশ্চিমাংশ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; (৪) সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রোশবসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে; (৫) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কেবলমাত্র পুলিশ ও বাঙালি ই.পি.আর. বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে; (৬) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে; (৭) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (৮) এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা মূলত: স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে লড়াই হবে তার প্রতি এক 'নির্দেশনা'।

ঐদিনই সরকারি গণবিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করা হলো যে, 'চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজ শাহ কলোনী এবং অয়্যারলেস কলোনী থেকে দাঙ্গাকারীদের হাতে ৭৮ জন মারা যায় এবং ২০৫ জন আহত হয়।' জনগণ এই মিথ্যা বানোয়াট গণবিজ্ঞপ্তিকে বিশ্বাস করেনি। চট্টগ্রামের ঘটনাটি ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত এবং অবাঙালি সৈনিকদের আগে থেকেই কলোনী এলাকায় এনে রাখা হয়েছিলো। কলোনীগুলোর অবাঙালিরা ও অবাঙালি সৈনিকরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং এদের সংখ্যা ছিলো কয়েকগুণ বেশি। সৈয়দপুরেও সেদিন বিহারীরা নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে। অসংখ্য হতাহতের কথা সামরিক সরকার চেপে যায়। তাজউদ্দীন আহমেদ পরদিন এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন ১৫টি নির্দেশনামায় বাংলার সরকারি-বেসরকারি অফিস, স্টেট ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক, বিদ্যুৎ, ট্রেজারি ও পানি-গ্যাস-ডিজেল এবং পুলিশ ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। সেদিন দেশব্যাপী কালো পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হয়।

'জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ নেয়ার জন্য কোনো বিচারপতি খুঁজে পেলেন না। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বিচারপতি সিদ্দিকী শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। মূলত: তিনি প্রদেশের ডিফ্যাক্টো শাসক আওয়ামী লীগকে ক্ষেপাতে চাইলেন না।' ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে সরকারি প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে সিদ্দিক সালিকের বিবরণ উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন: '৭ মার্চ পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি: ফারল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন। কিছুক্ষণ পর এক বাঙালি সাংবাদিক, নাম মি: রহমান টেলিফোনে আমাকে বললেন, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।' মুজিব-ফারল্যান্ড বৈঠক সম্পর্কে জি ডাবলিউ চৌধুরী বলেছেন, 'রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড মুজিবের কাছে আমেরিকার নীতিমালা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। তিনি মুজিবকে জানিয়ে দেন বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনায় তিনি যেনো ওয়াশিংটনের দিকে না তাকান।'

শেখ মুজিবের ভাষণ দেবার কথা ছিলো ২টা ৩০ মিনিটে (স্থানীয় সময়)। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র নিজ উদ্যোগে সরাসরি তাঁর ভাষণ প্রচারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করলো। রেডিও'র ঘোষকরা আগে থেকেই ইস্পাত দৃঢ় লক্ষ লক্ষ দর্শকের নজিরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করলো।

সামরিক প্রশাসকের দফতর এতে হস্তক্ষেপ করে এ 'বাজে' ব্যাপারটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। আমি বেতার কেন্দ্রে আদেশটি জানিয়ে দিলাম। আদেশটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফোনের অপর প্রান্তের বাঙালি বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কণ্ঠকে প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করবো না।' এই কথার সাথে সাথে বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গেল।' ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫

বেতারের সকল কর্মচারি মুহূর্তের মধ্যেই ধর্মঘট শুরু করলেন। যে মুজিব ৩ মার্চের মিটিংয়ে (যেখানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন) ছাত্র নেতাদের দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের দৃশ্য দেখেছিলেন এবং সেদিন থেকে সেই পতাকা ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নর হাউজ ছাড়া সকল সরকারি বেসরকারি অফিস আদালতে শোভা পাচ্ছিলো, সে পতাকা, 'তিনিই জনসভায় উত্তোলনের ব্যাপারটি নাকচ করে দিলেন। উত্তেজনা ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে জমা হচ্ছিলো। তিনি মঞ্চে আরোহণ করলেন। একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ) মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ বজ্র কণ্ঠে শুরু করলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর নিচুতে নামিয়ে আনলেন বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। কিন্তু ২৫ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয়ে চারটি শর্তারোপ করলেন। এগুলো হলো: (১) মার্শাল ল'

তুলে নিতে হবে। (২) জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (৩) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (৪) বাঙালি হত্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙে পড়েছিলো– ভাটার টানধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চললো ... 'তাদের (সেদিনের) ভেতরকার সে আগুন যেনো থিতিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সে আগুনকে ধাবিত করা যেতো। আমাদের অনেকেরই আশংকা ছিলো এরকমই। এ বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিলো। সদর দফতর থেকে ... একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ'।' ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

'...মুজিবের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে কোনো কোনো বিষয়গুলো প্রভাব ফেলেছিলো, তা নির্ধারণের চেষ্টায় বসে গেলেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা কারণগুলো তালিকাভুক্ত করলেন। (১) হতে পারে, প্রেসিডেন্ট যে 'জলপাই' শাখা উঁচিয়ে ধরেছিলেন, ('আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে যা আপনাকে আপনার 'ছয় দফা' থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না।'), সেটাকে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন। (২) হতে পারে, ফারল্যান্ডের সফর ভারসাম্য রক্ষা করেছে। (৩) এও হতে পারে, জিওসি যে হুমকি দিয়েছিলেন ('আমি সেখানেই রেসকোর্সে থাকবো চরমপন্থীদের আক্রোশ থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য। কিন্তু এও বলে দিলেন, আমি সম্ভাব্য সবকিছুই জড়ো করবো, বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান সবই। প্রয়োজন যদি হয় ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো। তখন শাসন করার জন্য কেউ থাকবেনা কিংবা শাসিত হবার জন্যও কিছু থাকবেনা') সেটা হয়তো কৌশলে পরিণত হয়ে গেছে। হতে পারে, তিনটেরই প্রভাব একসঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু কেউই একে পাকিস্তানের প্রতি মুজিবের খাঁটি ভালোবাসা হিসেবে নির্দেশ করার মনোভাব দেখালো না।' ঐ, পৃষ্ঠা-৬৬

৯ মার্চ ঢাকায় মাওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও চলমানরত আন্দোলনকে সমর্থন এবং একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, '...

নির্বিচারে গণহত্যা করে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করে ... প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকারের শেষ রক্ষা হয় নাই... ইয়াহিয়াকে বলি, অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। 'লাকুম দ্বীনকুম ওয়ালিয়া দ্বীন'-এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। ...আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে... তুমুল আন্দোলন শুরু করবো। খামোখা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না, মুজিবকে আমি ভালো করে চিনি।' এ প্রসঙ্গে 'আমি বিজয় দেখেছি' বইয়ের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় এম.আর.আক্তার মুকুল বলেছেন, 'স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে প্রগতিশীল কর্মীদের প্রায় বিচ্ছিন্ন হবার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। ...তবু প্রবীণ জননেতা মাওলানা ভাসানীর এই বক্তব্য বিলম্বে হলেও প্রগতিশীল কর্মীদের চিন্তাধারায় বিভ্রান্তির কিছুটা অবসান ঘটতে সক্ষম হয়েছিলো।'

অন্যদিকে 'পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচিত সংখ্যালঘু দলগুলোর প্রতিনিধিগণ মাওলানা মুফতি মাহমুদের সভাপতিত্বে শেখ মুজিবের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। এসব নেতৃবৃন্দ সরকার গঠনে এবং সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে দেয়ার আহ্বান জানান এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রস্তাব করেন। অথচ ভূট্টো বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি মোতাবেক পার্লামেন্টের বাইরে সংবিধান সংক্রান্ত সমঝোতা ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পৃথকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।' আর ১৫ মার্চ ভূট্টো সাংবাদিকের সামনে বলেন, শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জন্য পাকিস্তানের শাসন পরিচালনা করা যাবে না। পার্টি (ভূট্টোর পার্টি) বাদ দিয়ে কোনো সরকার গঠন সম্ভব নয়।'

১৫ মার্চ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।' আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার জন্য সর্বমোট ৩৫ টি নির্দেশাবলী ঘোষণা করলো। এ নির্দেশাবলী সমাজের সর্বস্তরে তথা সরকারি অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল ক্ষেত্রেই মেনে চলা হলো। এমনকি রেডিও, টিভিও মুজিবের আদেশ মেনে চললো। মুজিবের শাসন সারা প্রদেশকে গ্রাস করলো।' ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭।

ঐদিন ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য। সিদ্দিক সালিকের বর্ণনায়: '১৫ মার্চ যে পরিবেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন, তা

কোনো দিনই ভুলবার নয়। বিমান বন্দরের সব পথই বন্ধ করে দেয়া হয়। টার্মিনাল ভবনের ছাদের উপর হেলমেট পরিহিত সৈনিকদের পাহারায় বসানো হয়। অনুসন্ধানী ক্যামেরা বসানো হয় বিমানবন্দর ভবনের প্রতিটি করিডোরে। পিএএফ গেটের কাছে টারম্যাকে পৌঁছানোর একমাত্র গেটটিতে পাহারার জন্য একদল নির্বাচিত সৈনিক বসানো হয়। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাবার জন্য পদাতিক ব্যাটালিয়নের (১৮ পাঞ্জাব) এক কোম্পানি সৈনিক মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে ট্রাকে বসে অপেক্ষা করছিলো। ... কোনো ফুলের তোড়া ছিলো না। ছিলো না বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সারি, মিডিয়া কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি কিংবা ফটোগ্রাফারের ফ্লাশের আলোর ঝিলিক।

ঢাকা সফর সম্পর্কে আগেই মুজিব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে 'বাংলাদেশের অতিথি' হিসেবে স্বাগত জানানো হবে।' ইয়াহিয়ার বিমান শ্রীলংকা ঘুরে ঢাকায় এসে বেলা তিনটায় পৌঁছায়। ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউজে (বর্তমান সুগন্ধায়) মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার দেখা হলো। দু'জনের কারোরই কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। দু'জনই ভিন্ন দৃষ্টিতে কথাবার্তা বললেন। আলোচনা মূলতবী হলো। পরদিন ১৭ মার্চ দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মুজিবের সাথে সহযোগীরা ছিলেন; ইয়াহিয়াও তার পরামর্শদাতাদের সাথে রাখেন। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন, 'লক্ষ্যে উপণীত না হওয়া পর্যন্ত বাঙালির সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।' সেদিন ছিলো মুজিব ভাইয়ের ৫১তম জন্মদিন। জন্মদিনে সাংবাদিকদের শুভেচ্ছার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, এই দু:খিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কি? মৃত্যুদিনই কি? ... পশ্চিমাদের ইচ্ছামত আমাদের প্রাণ দিতে হয়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোনো নিরাপত্তা তারা রাখেনি। জনগণ আজ মৃত প্রায়। ...আমার জীবন নিবেদিত আজ জনগণের জন্যে।'

এ দিন বৈঠকের পর 'ইয়াহিয়া খান আলোচনার বিবরণী দানকালে বলেন, 'হারামজাদাটা ভালো ব্যবহার করলো না। তুমি (জে.টিক্কা) তৈরি হয়ে যাও।' রাত ১০ টায় টিক্কা খান জিওসিকে টেলিফোনে বলেন, 'খাদিম, তুমি এগিয়ে যেতে পারো।' এর অর্থ এভাবে ধরে নেয়া হলো, সামরিক কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও কাগজপত্র তৈরি করা যেতে পারে। ... কয়েকজন বিদেশি লেখক বলেছেন, 'ঢাকা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করা হয় সামরিক শক্তি ও পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করার জন্যে।' ঐ, পৃ-৭৪

'মূল অপারেশনাল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্যে ১৮ মার্চ (সকালে) জিওসির অফিসে মে. জে. খাদিম রাজা ও মে. জে. ফরমান বৈঠকে বসেন। তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন, অপারেশন 'ব্লিৎস' (হঠাৎ ক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড আক্রমণ) এর মূল লক্ষ্য (আদর্শ ধারায় সামরিক আইন প্রয়োগ) নানা ঘটনার চাপে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। এখন যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তা যখনই করা হোক– তার লক্ষ্য হবে, মুজিবের ডিফ্যাক্টো শাসনকে উৎখাত এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করা।...১৬টি প্যারা সম্বলিত পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন পরিকল্পনাটির নামকরণ হলো অপারেশন সার্চ লাইট।' ঐ, পৃ-৭৫

১৯ মার্চ আবারো জয়দেবপুরে বর্বর বাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বিবৃতিতে বলেন, 'যারা মনে করেন, তাদের বন্দুকের বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবেন, তারা আহাম্মকের স্বর্গে আছেন। ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের বৈঠকে ইয়াহিয়া মুজিবের কাছে 'জয়বাংলা'র ব্যাখ্যা জানতে চাইলে, মুজিব বলেন, শেষ নি:শ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয়বাংলা' উচ্চারণ করবেন।

আর ২০ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব চতুর্থ বৈঠকে উভয়ে ৫ সহযোগীসহ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, লে. জে. আবদুল হামিদ ও লে. জে. টিক্কা খান গণহত্যার নীলনক্সা 'অপারেশন সার্চ লাইট' নিয়ে আলোচনা করে, টিক্কার প্রস্তাব ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের সময় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করার অংশটি ইয়াহিয়া বাদ দিয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতার উপর জনগণের আস্থাকে আমি নির্মূল করতে পারি না। গণতন্ত্রের উপর একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে চিহ্নিত হতে চাই না'।' ঐ,৭৫-৭৬ পৃ:

২১ মার্চ ভূট্টো তাঁর পরামর্শদাতাদের নিয়ে ঢাকায় এসে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার দাবি করেন। এদিন ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয়। ইয়াহিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মতামত সমন্বয় সাধন করে একটা সন্তোষজনক সুরাহার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা বলেন। সে বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক আর জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের গতি কোনোভাবেই মসৃণ করা যাবে না। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সাফল্য নিশ্চিত। কোনো জাতির পক্ষে আত্মদান ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। একটা ঐক্যবদ্ধ

জাতিকে বেয়োনেট ও বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না।'

২২ মার্চ (বর্তমান সুগন্ধায়) ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের বৈঠকে একটা সমঝোতা হয়। এতে নতুন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'প্রয়োজনবোধে পাকিস্তানের দুই অংশে দুই জন প্রধানমন্ত্রী হবে। কনফেডারেট পাকিস্তান হবে। বাংলাদেশের কাছে থাকবে অর্থমন্ত্রণালয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে থাকবে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়।' এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হন। এ কথা পূর্বেই মুজিবের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মারফত প্রকাশ পেলে চার যুবনেতা, বেগম মুজিব, 'নিউক্লিয়াস' এবং 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'র মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুগন্ধা থেকে বেরুলেই চার যুবনেতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন ও এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বেগম মুজিব আরো তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'ওরা তোমাকে পিণ্ডিতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে, নতুবা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো ষড়যন্ত্র করে তোমাকে প্রধানমন্ত্রী থেকে একদিন ফেলে দিয়ে রাস্তায় বসাবে। তখন তুমি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং জনগণের আস্থা হারাবে।' প্রত্যেকেই ঐ রাতে আবার শেখ মুজিবের বাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করে নিজেদের আপত্তি জানিয়ে আসেন। সারারাত মুজিব অস্থিরভাবে নিজের ঘরে পায়চারি করে কাটিয়ে দিয়ে ভোরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি পরে চার যুবনেতা ও কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াস'র আমাদের তিন জনকে এবং 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'র নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোরা সত্যই স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? আমাকে দালাইলামা (তিব্বতের ধর্মীয় গুরু ও রাজা) বানাবি না তো।'

এর প্রমাণ, ২৩ তারিখে ইয়াহিয়া-মুজিব কোনো বৈঠক হয়নি। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলো। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিবে। সিদ্দিক সালিকের ভাষায় এই কনভেনশনে 'গোড়াতেই জাতীয় পরিষদের দু'টি কমিটিতে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এম.এন.এ.-দের সমন্বয়ে) ইসলামাবাদ ও ঢাকাতে পৃথক বৈঠকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর দু'টো রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদ বৈঠকে বসবে এবং একটি আপোষ ফর্মূলা বের করে আনার চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে নিশ্চিত করে সেটা জারি করা যেতে পারে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় মারাত্মক পরিণতির

সম্ভাবনা বহন করছিলো। যদি সামরিক আইন তুলে নেয়া হয় তবে ইয়াহিয়া সরকার আইনগত বৈধতা হারাবে এবং প্রদেশগুলো 'স্বাধীন সত্তা' দাবি করার ব্যাপারে অবাধ অধিকার লাভ করবে।' এ ছাড়াও প্রস্তাব ছিলো যে, পূর্ব বাংলায় 'এক লক্ষ সদস্য'র একটি প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী থাকতে হবে। সিদ্দিক সালিক বলেন, 'দুই কমিটির প্রস্তাব আমি সহকর্মীদের জানালাম। তারা এ ব্যাপারে তাদের আশংকা প্রকাশ করে পরামর্শ দিলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত হবে না। কেননা, এর ভেতর দুই পাকিস্তানের বীজ রোপিত আছে'।' ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫,৭৬ ও ৭৯

শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে জানান যে, 'আগে দুই দেশের প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে বসবে। তারা দু'টি পৃথক খসড়া সংবিধান প্রস্তাব করবে। পরে দুই অঞ্চলের (কেন্দ্রীয়) জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য গ্রহণযোগ্য পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে বসে এক ও অভিন্ন একটি সংবিধান রচনা করবে।' এ প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার দ্বিমত না থাকলেও তার সহযোগী লে. জে. পীরজাদার ঘোরতর আপত্তি থাকায় প্রস্তাবটি ইয়াহিয়া প্রত্যাখ্যান করলেন।

সেদিন মুজিব ভাই চার যুব নেতাদের ডেকে বলেছিলেন, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তোরা ঐ হায়নাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবি তো?' যুদ্ধের ব্যাপকতা ও নৃশংসতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলেও চার যুবনেতা সেদিন বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেছিলেন। সেদিন ঐ সমঝোতার পেছনে বা কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের পিছনে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল বা গূঢ় রহস্য ছিলো তা নিন্দুকের ভাষায় সমালোচনা না করে, সময় ও পরিস্থিতির গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং গভীরতা উপলব্ধি করে সবলতা-দুর্বলতা নির্ণয় করতে গবেষকদের আহ্বান করছি।

পরবর্তী ২৩ মার্চ, পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক দিবসে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তানের পতাকা' পুড়িয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে, 'জয়বাংলা বাহিনী'র চারটি প্লাটুন মার্চপাস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাকে

অভিবাদন জানায় এবং পতাকা উত্তোলনের সময় ৭ মি.মি. রাইফেলের গুলির আওয়াজে পতাকাকে স্বাগত জানানো হয়। পরে 'জয়বাংলা বাহিনী' বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি ও বাসভবনে বাংলাদেশের 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করা হয়। মূলত: ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ '৭১ এর কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো। শেখ মুজিব প্রকৃত অর্থে ছিলেন বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। তার নির্দেশে এবং তার নামেই বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছিলো। তাই বলবো '৭২এ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব থেকে '৭১ এর ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের ডিফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন অনেক শক্তিশালী ও জনগণের একান্ত আপনজন। উল্লেখ্য মার্চের প্রতিটি ঘটনা ও কর্মযজ্ঞ 'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে তা প্রচারিত হতো।



জেনারেল টিক্কা খানের সাথে শলা-পরামর্শরত গোলাম আজম, নুরুল আমিন গং

২৩ মার্চ সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক তার বইয়ের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলো। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়ালো, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো এবং তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করলো। অন্যদিকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ালো এবং জাঁকজমকের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির প্রদর্শনী করলো। রেডিও এবং টেলিভিশন 'নতুন জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার বাংলা' গানটি বাজালো। এ শুধু ছাত্রদের তামাশা ছিলো না। মুজিব নিজেই এর অংশীদার ছিলেন। সকালে তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে (ডিফ্যাক্টো প্রেসিডেন্ট ভবন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দেন। বাড়ির সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করে এগিয়ে যাওয়া ছাত্রদলের সালাম গ্রহণ করেন। সারা শহর ছেয়ে যায় তামাটে লাল ও সোনালী রংয়ের পতাকায়। পাকিস্তানের পতাকা তখন মাত্র দু'টি স্থানে দেখা গেলো। একটি উড়ছিলো গভর্নর হাউজে ও অন্যটি

সামরিক আইন সদর দফতরে।' ঐ, পৃ.৭৯

হানাদারদের আক্রমণ পরিকল্পনা ও গণহত্যা

সিদ্দিক সালিকের ভাষায়: 'অপারেশনের মূল পরিকল্পনার 'খসড়া প্রণয়নের জন্যে ১৮ মার্চ জিওসি অফিসে মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা ও মে. জে. রাও ফরমান আলী বৈঠকে বসেন। তারা একমত হন যে, 'অপারেশন ব্লিৎস' এর আর প্রয়োজন নেই। কেননা ১ মার্চ পর্যন্ত সহযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শন করা হয়। তারা আরো একমত হলেন যে, নানা ঘটনার চাপে 'ব্লিৎস' এর মূল লক্ষ্য (নিজস্ব ধারায় সামরিক আইনের প্রয়োগ) সরে গেছে। এখন যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ... তার লক্ষ্য হবে মুজিবের ডিফ্যাক্টো শাসনকে উচ্ছেদ করে সরকারের কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করা। ঐ বৈঠকে জে. ফরমান হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের উপর একটি কাঠ পেন্সিল দিয়ে নতুন পরিকল্পনাটি লিপিবদ্ধ করেন। আমি জে. ফরমানের হাতে মূল পরিকল্পনাটি দেখেছিলাম। পরিকল্পনাটির দ্বিতীয় অংশটি লেখেন জে. খাদেম। ১৬টি প্যারা সম্বলিত পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এ পরিকল্পনাটির নামকরণ করা হল 'অপারেশন সার্চ লাইট' ।'ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫

'ধারণা করা হলো যে, এর বাস্তবায়নে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানসহ সকল বাঙালি সৈনিক বিদ্রোহ করবে। সুতরাং তাদের নিরস্ত্র করতে হবে। দ্বিতীয়ত: মুজিব যে 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করেছেন, সেই আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে হবে। পরিকল্পনায় আরো ১৬ জন প্রখ্যাত লোকের নাম তালিকাভুক্ত করা হলো। তাদের বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়া হবে এবং তাদের গ্রেফতার করা হবে।

২০ মার্চ বিকেলে 'ফ্লাগস্টাফ' হাউজে জে. হামিদ ও লে. জে. টিক্কা খানের সামনে হাতে লেখা পরিকল্পনাটি পড়া হলো। দু'জনেই পরিকল্পনাটির প্রধান প্রধান বিষয়বস্তুগুলো অনুমোদন করলেন। কিন্তু জে. হামিদ বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণের ধারাটি বাতিল করে দেন। কেননা তার মতে, 'এই ধারাটি বিশ্বের একটি অন্যতম সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবে।' তিনি অবশ্য আধা-সামরিক বাহিনী যেমন, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করার কথা বললেন। মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'বিভিন্ন কাজের জন্য সেনা বন্টনের পর রিজার্ভ সৈন্য কি তোমাদের হাতে থাকবে?' জিওসি বললেন, 'না, স্যার'।

পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিকল্পনার একটি মৌলিক ধারা বাতিল করে দেন।

নির্ধারিত তারিখে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে– এ বিষয়টি তিনি মেনে নেননি। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'রাজনৈতিক সমঝোতার উপর জনগণের আস্থাকে আমি নির্মূল করতে পারি না। গণতন্ত্রের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে চিহ্নিত হতে চাইনা'।' নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল পৃ.৭৫-৭৬।

'অন্যদিকে মুজিবের ডিফ্যাক্টো কমান্ডার-ইন-চীফ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এমএজি ওসমানী ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করেন (এ বিষয়টি অন্য কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত করা যায়নি- সম্পাদক)। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন– যাতে মুজিবের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেরিয়ে আসতে পারে। মে.জে.ডি.কে পালিতের মতে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের কার্যক্রম কর্নেল ওসমানীর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো-

ক. পূর্ব পাকিস্তান অবরোধের জন্য ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দখল করা।

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাঁটি করে ঢাকা নগরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র ছাত্ররা তাদেরকে সাহায্য করবে।

গ. পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা ক্যান্টনমেন্ট দখলের দায়িত্ব নিবে।

কিন্তু প্রথম আঘাত কোন ব্যক্তি হানবে কিংবা কে সর্বপ্রথম ঘটনার সূত্রপাত ঘটাবে, তা জানা গেলো না।' (ঐ, পৃষ্ঠা-৭৬)

'পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যখন পি.আই.এ. ফ্লাইট ধরার জন্য ব্যস্ত সে সময় জে. ফরমান ও জে. খাদিম দু'জনে দুটি হেলিকপ্টারে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার কমান্ডারদের (ঢাকার বাইরে অবস্থানরত) কাছে নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়ার জন্য। নির্দেশটি ছিলো, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তখন পর্যন্ত (অপারেশন সার্চলাইট) পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হয়নি।' তবে অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়নে গেলে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নসহ সকল বাঙালি সৈনিক বিদ্রোহ করবে। সুতরাং তাদের নিরস্ত্র করতে হবে। (ঐ পৃ.৮০)

'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর নেতৃবৃন্দের পরামর্শ নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিসেনার প্রধানের দায়িত্ব অর্পন করেন।

তারা যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার দূররানী (যশোর) ও ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে

(কুমিল্লা) পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ফরমান ঢাকায় ফিরে এলেন। আর খাদিম কুমিল্লা থেকে গেলেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম ছিলো প্রতারণামূলক স্থান। সেখানকার একমাত্র সিনিয়র অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে সবাই জানতো। অত্যন্ত নিপুণভাবে জিওসি পরিস্থিতি সামাল দেন। সবচেয়ে সিনিয়র অবাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতিমীর কাছে গোপনে নির্দেশটি পাচার করে দেন। কুমিল্লা থেকে ইকবাল শফি এসে পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে শক্ত করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বললেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বোঝালেন যে, জয়দেবপুরে অবস্থানরত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের শান্ত করার জন্য 'ব্যাঘ্র পিতা'কে সেখানে একবার উঁকি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে তার কথা বলতে হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার রাজি হলেন। তাকে ঢাকায় আনা হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তার আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটলো।

একই মিশন নিয়ে অন্য দূতরা উড়ে গেলেন সিলেট, রংপুর ও রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে। বলা হলো, আঘাত হানার সময় পরে টেলিফোনে জানানো হবে। কেননা প্রেসিডেন্ট এখনো আদেশ দেননি। সরকারিভাবে তখনো আলোচনার জন্যে দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো। ইতোমধ্যে যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করে ঢাকার ৫৭ ব্রিগেড লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করলো। একাজে তারা বেসামরিক পোশাক ও গাড়ি ব্যবহার করলো।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসলামাবাদ থেকে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। মেজর জেনারেল ফরমান আলী লিখিত তার ঘোষিতব্য ভাষণের একটি খসড়া কপি তার হাতে তুলে দেয়া হলো। ভাষণের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো ছিলো-

১. মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কলঙ্কিত করা উচিত হবে না। বরং চরমপন্থীদের হাতে বন্দি একজন দেশপ্রেমিক তিনি।

২. মুজিবকে কোনো অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়নি। তাকে রক্ষার জন্য হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

৩. ভাষণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পরিধি সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য থাকা উচিত।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রচারিত হলো। উপরোক্ত বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হলো। মুজিবের কর্মতৎপরতাকে দেশদ্রোহিতামূলক ঘোষণা (পাশাপাশি মুজিব কর্তৃক একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে) তিনি বললেন 'এটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। তার এই ঘোষণা ১ মার্চ দেয়া মুজিবের বজ্র ঘোষণারই প্রতিধ্বনি করলো। মুজিবও ওই সময় বলেছিলেন 'এটাকে (জাতীয় পরিষদের স্থগিতকরণ) বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না।' ঐ পৃ.৮০-৮১

২৫ মার্চ, সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। 'তার ঢাকা ত্যাগের খবর গোপন রাখা হলো। জনতার চোখে ধুলো দেয়ার জন্য একটা ছোট্ট নাটকের অবতারণা করা হলো। প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্লাগ স্টাফ (ক্যান্টনমেন্ট) হাউজে গেলেন। সূর্য অস্ত যাবার আগেই প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী অশ্বারোহীদল প্রেসিডেন্ট হাউজে ফিরে এলো। সামনে পাইলট জীপ, পাশে রক্ষী দলের গাড়িবহর, মাঝখানে প্রেসিডেন্টের গাড়ি। কিন্তু গাড়িতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। মুজিবের গুপ্তচররা খেলাটা ধরে ফেললো। বাঙালি লে. ক. এ. আর. চৌধুরী ছিলেন ইয়াহিয়ার স্টাফদের একজন। তিনি দেখলেন প্রেসিডেন্টের মালামাল ডজ গাড়িতে করে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে খবর পাঠালেন। সন্ধ্যে সাতটায় ইয়াহিয়া বিমানে উঠার জন্য পি.এ.এফ (এয়ার ফোর্স) গেট দিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকলেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার (পরে এ.ভি.এম.ও মন্ত্রী) তাঁর অফিসে বসে এ দৃশ্যটি দেখলেন। সাথে সাথে খবর পাঠিয়ে দিলেন মুজিবের কাছে।' ঐ, পৃষ্ঠা ৮২

'২৫ মার্চ সকাল এগারোটায় লে. জে. টিক্কা খান আদেশ দিলেন, 'খাদিম আজ রাতেই'। আদেশ বাস্তবায়নের জন্যে জে. খাদিম বার্তাটি তার স্টাফদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। চতুর্দশ (১৪) ডিভিশনের প্রধান স্টাফ অফিসাররা ঢাকার বাইরের গ্যারিসনসমূহকে আঘাত হানার সঠিক সময়টি টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিলো। নির্দেশ হলো, সব গ্যারিসনকে এক সঙ্গেই কাজে নামতে হবে। ২৬ মার্চ রাত একটায় (০১০০ঘ.) চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত হলো। হিসেব করা হয়েছিলো যে, ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিরাপদে করাচি পৌছে যাবেন।'

অপারেশন 'সার্চলাইট' পরিকল্পনায় দু'টো সদর দফতর সৃষ্টির পরিকল্পনা হলো। একটি ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অধীনে ৫৭ নাম্বার ব্রিগেডকে দিয়ে। মে. জে. ফরমানের উপর এর অধিনায়কত্বসহ ঢাকা নগরী ও এর উপকণ্ঠে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্যদিকে মে.জে. খাদিমকে দেখতে হবে সমগ্র প্রদেশ।

এছাড়া লে.জে. টিক্কা খান ও তার ব্যক্তিগত স্টাফরা সামরিক আইন সদর দফতরে রাত্রিযাপন করবেন ঢাকা নগরীর ভেতরে ও বাইরে নেয়া ব্যবস্থাবলির অগ্রগতি লক্ষ্য করার জন্য।

যদি খাদিম ও ফরমান হামলায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে তাদের অপসারণ করে স্থান পূরণের জন্যে কয়েকদিন আগেই ইয়াহিয়া মে. জে. ইফতেখার জানজুয়া ও আবু বকর ওসমান মিঠাকে (মিঠ্‌ঠি) ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক সময়েও তারা দু'জনই অর্থাৎ জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান জেনারেল ইয়াহিয়ার চিন্তাধারাকেই ধারণ করে চলছিলেন। তাই হামলায় অংশ নেয়ার ব্যাপারে তাদের মনোভাব জানার জন্যে জে. হামিদ পৃথক পৃথক ভাবে খাদিম ও ফরমানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। যাহোক শেষ পর্যন্ত দুই জেনারেলই হামিদকে আশ্বাস দেন যে, তারা বিশ্বস্ততার সাথে আদেশ পালন করবেন।' (ঐ পৃ.৮৩)

গণহত্যা বা অপারেশন সার্চ লাইট

'লক্ষ্য এলাকায় সৈনিকদের রাত একটার আগে পৌঁছাতে হবে। কেউ কেউ মনে করলো রাস্তায় দেরি হয়ে যেতে পারে। ফলে ১১টা ৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে যাত্রা শুরু করলো।... ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম সেনাদলটি ফার্মগেটে বাধার সম্মুখীন হলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। সদ্য কাটা বড় বড় গাছের গুঁড়ি; রাস্তায় আড়াআড়িভাবে ফেলে প্রথম দলের গতি থামিয়ে দেয়া হলো। পুরোনো গাড়ির খোল এবং অকেজো স্টীম রোলার টেনে এনে পাশের ফাঁক আটকে দেয়া হয়। ব্যারিকেডের অপর পার্শ্বে শহরের দিকে আওয়ামী লীগের কয়েক'শ কর্মী দাঁড়িয়ে 'জয়বাংলা' শ্লোগানে উচ্চকণ্ঠ ছিলো। ... মুহূর্তে রাইফেলের গুলির কিছু শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের 'কিচিরমিচির' আওয়াজে ...'জয়বাংলা' শ্লোগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেলো। স্পষ্টতই অস্ত্র জয়ী হলো। সেনাদল শহরের ভেতর এগিয়ে গেলো।

মুজিবের বাসভবন হামলাকারী প্লাটুনের সঙ্গে ছিলেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেনান্ট কর্নেল জে. এ. খান ও কোম্পানি কমান্ডার মেজর

এই ট্রান্সমিটার দিয়েই প্রচারিত হয়েছিলো স্বাধীনতার সপক্ষে দৃপ্ত আহ্বান

বিল্লাল। কমান্ডোরা মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি হলে গেটে অবস্থানরত সশস্ত্র পাহারাদারদের গুলির সম্মুখীন হলো। পাহারাদের দ্রুত অকেজো করে ফেলা হলো এবং মুহূর্তে পঞ্চাশজন শক্ত সামর্থ্য সৈন্য দৌড়ে চার ফুট উঁচু দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বাড়ির উঠানে নামলো। স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে তারা তাদের উপস্থিতির সংবাদ ঘোষণা করলো এবং চিৎকার করে শেখ মুজিবকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালো। কিন্তু কোন উত্তর এলো না। তারপর ধুপধাপ শব্দ তুলে হুড়োহুড়ি করে বারান্দায় উঠলো তারা। মুজিবের শোবার ঘর খুঁজে বের করলো দরজা বাইরে থেকে তালা মারা ছিলো। বুলেটে তালাটা ভাঙ্গা হলো। মুজিব তৎক্ষণাৎ রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রেফতারের জন্য নিজেকে সোপর্দ করলেন। মনে হলো তিনি এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।' ঐ, পৃ.৮৬

সিদ্দিক সালেকের বর্ণনায়ঃ 'প্রায় রাত দু'টোয় বেতার যন্ত্র থেকে সংবাদ পেলাম, যন্ত্রের অপর প্রান্তে ছিলো একজন ক্যাপ্টেন। সে জানালো, 'ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে তাকে প্রচণ্ড রকমের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেই মুহূর্তে একজন সিনিয়র অফিসার আমার হাত থেকে যন্ত্রটি কেড়ে নিলেন এবং 'মাউথপিসটা' মুখের সামনে এনে চিৎকার করে বললেন, 'লক্ষ্যকে ধ্বংস করতে তোমার কতক্ষণ লাগতে পারে?' 'চার ঘন্টা।' 'ননসেন্স কি কি অস্ত্র আছে তোমার কাছে?' ... 'রকেট লঞ্চার রিকয়েললেস রাইফেলস, মর্টার...' 'ঠিক আছে সবগুলোই ব্যবহার করো। সম্পূর্ণ এলাকাটা দু'ঘন্টার মধ্যে দখলের ব্যবস্থা করো।' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভোর চারটায় দখলে এলো।' ঐ, পৃ.৮৭

'শহরের বাদবাকি অংশ সৈনিকরা তাদের কাজ ভালোভাবেই সম্পাদন করলো। রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী এবং পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করলো।' ২৬ মার্চের ভোরে সৈনিকরা তাদের মিশন সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করলো। জে. টিক্কা ভোর পাঁচটায় সোফা ছেড়ে উঠলেন এবং নিজের অফিসে ঢুকলেন। রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন, 'একটা মানুষও নেই। দৃষ্টি ফেললাম, একটি মাত্র বেপথো কুকুর দেখতে পেলাম। দু'পায়ের মাঝে লেজটি গুটিয়ে চোরের মত শহরের দিকে যাচ্ছে।' বেলা বাড়তেই ভূট্টোকে তার হোটেল কক্ষ থেকে বের করে আনা হলো এবং সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভূট্টো প্লেনে ওঠার আগে গত রাতের সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করে একটি সাধারণ মন্তব্য করলেন।' তাঁর সশস্ত্র প্রহরীদের প্রধান ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে বলেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ,

পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' করাচি পৌঁছে তিনি ঐ উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন।' (ঐ,পৃ-৮৭-৮৮)

সিদ্দিক সালেকের বর্ণনায়: 'যখন ভুট্টো এই আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেন তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণকবরগুলো দেখছিলাম। পাঁচ থেকে পনেরো ব্যাসার্ধের তিনটি গর্ত দেখতে পেলাম। সেগুলো সদ্য তোলা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। কোনো অফিসারই মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করতে চাইলো না। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের চারপাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকে মনে হয়েছিলো হামলার ফলে দু'টি ভবনই মাটির সাথে মিশে গেছে। আপাত: দৃষ্টিতে মনে হলো, ইকবাল হলে দুটি এবং জগন্নাথ হলে চারটি রকেট আঘাত হেনেছে।' ... ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, 'বাঙালিদের ভাল করে এবং ঠিকমত নিবীর্য করা হয়েছে; অন্তত একটি বংশধরের জন্য তো বটেই। মেজর মালিক তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ওরা শুধু শক্তির ভাষাতেই চলে। ওদের ইতিহাসই এ কথা বলে।' (ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮-৮৯)

হায়েনাদের বর্বরতার কোনো তুলনা হয় না। ২৫ মার্চ কালরাতে (রাত ১১.৩০ মি:) ঘুমন্ত, অসহায়, নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ঢাকাসহ বাংলার সকল ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলোতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। ঢাকায় হায়েনাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলো সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা ই.পি.আর.সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, শহরের হিন্দু এলাকা ও বস্তি এলাকার দিনহীন মানুষগুলো। ঢাকার নাখালপাড়া থেকে গেন্ডারিয়ার রেললাইনের বস্তি এলাকায় আগুন দিয়ে চারপাশ থেকে এল.এম.জি. ব্রাস করে ৯০ ভাগ বস্তিবাসীকে হত্যা করা হয়। ভিয়েতনামের এক 'মাইলাই'য়ের ইতিহাসকে ম্লান করে শতাধিক 'মাইলাই' সৃষ্টি করেছিলো পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পশুরা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই হায়ানারা এমনি বর্বরতা চালিয়েছিলো এই বাংলায়।

২৫ মার্চ ও তারপরের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২৫ মার্চ '৭১ সাল। রাত তখন ১১টা। আমি আর মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) পলাশীর পশ্চিম পাশে আজিমপুর কলোনীর একটা বিল্ডিংয়ের তিন তলায় আশ্রয় নিলাম। বাসাটা সংগঠনের তৎকালীন ছাত্রলীগ কর্মী শিরীন আক্তারদের (পরে ছাত্রলীগ সভাপতি)। তার বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। এরই মধ্যে চতুর্দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে। মর্টার শেলিং, মেশিনগান ও এলএমজি'র ব্রাশ

ফায়ারের শব্দ। ভারি ট্যাংক চলার শব্দ। দু'একটা পাল্টা বন্দুক বা ২২ বোরের রাইফেলের গুলির শব্দ। মানুষের গগন ফাটানো আর্তচিৎকার ও দূর থেকে ভেসে আসা 'জয়বাংলা' শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো বেবী আইসক্রীমের মোড়ের যে ছেলেগুলো বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিলো, তারা কি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে? ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, সালাউদ্দিন ও আজাদরা যে অস্থায়ী মিনি ল্যাবরেটরী বানিয়ে বোমা তৈরি করছিলো, সেই বোমাসহ নিজেরা কি আত্মরক্ষা করতে পেরেছে? আমি অবশ্য এই আশ্রয়ে আসার আগে ওদের সরে যাওয়ার খবর পাঠিয়েছিলাম। রাত নয়টার সময় আবুল কাসেমকে (জিয়ার আমলের যুবমন্ত্রী) পাঠিয়েছিলাম হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরী থেকে মলোটভ ককটেল তৈরির উপযোগী এক ট্রাক বোতল আনতে। ভাবছিলাম যে তারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কিনা? বঙ্গবন্ধু আ স ম আবদুর রবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জিঞ্জিরার দিকে। ওর সাথে আমাদের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রও বুড়িগঙ্গার ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অস্ত্র সংগ্রহ হয়েছিলো '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের শেষে। ১৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরের লাশ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণের সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন, নওয়াব হাসান আসকারী ও খাজা খায়রুদ্দিনের পরিবাগস্থ বাড়ি এবং ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস.এ. রহমানের বাড়ি জনতা পুড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে বায়তুল মোকাররমের দু'টি অস্ত্রের দোকান ও দু'টি পুলিশ ফাঁড়ি লুট করে। ঐ অস্ত্রই ছাত্রলীগ কর্মী ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্যদের ট্রেনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে সারাদেশে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো সম্ভাব্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের কথা। আমাদের ঢাকা শহরের সকল কর্মীদের বলা হয়েছিলো আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করার এবং পরবর্তীতে সময় সুযোগ বুঝে বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরা, কলাতিয়া, রুইতপুর ও কোনাখোলায় যোগাযোগ করার জন্য। এরই মধ্যে কানে এলো সার্জেন্ট জহুর হলের দিক থেকে মর্টারসহ ভারি অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণের। সার্জেন্ট জহুর হল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের রেললাইনের বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশটাকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। হাটখোলার হরদেও থেকে পরিবাগের হাতিরপুল পর্যন্ত সেসময় যে বস্তি ছিলো তাতে লোকসংখ্যা ছিলো ৫০ হাজারের মতো ('৭০ সালের পরিসংখ্যান

মতে)। মনে হচ্ছিলো বস্তিবাসীরা সবাই ঐ আগুনে পুড়ে মরবে। একটু পরে পশ্চিম দিকে পিলখানার ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারে ভয়াবহ আক্রমণের আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোলাগুলি, মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার আর্তনাদ আর স্লোগানের আওয়াজ শুনছি। রাত দু'টার পর পিলখানার গোলাগুলির আওয়াজ কমে গেলো। বুঝলাম হানাদার বাহিনীর লোকেরা ই.পি.আর-এর বাঙালি সদস্যদের হত্যা অথবা বন্দি করে হেডকোয়ার্টারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম খুব কাছ থেকে বন্দুক অথবা ২২ বোরের রাইফেলের শব্দ। আঁৎকে উঠলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা আর্মি কনভয় লালবাগের দিকে যাচ্ছিলো। হঠাৎ করে উল্টো দিকে ঘুরে খুব দ্রুত নিউমার্কেটের দিকে চলে গেলো। এর পর পরই একটা জীপে দশজন বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিক ওখানে এসে উপস্থিত হয়ে চর্তুদিকে একনাগাড়ে গুলি করতে শুরু করলো। একটু পরে গ্যাসোলিনের বোতল ছুঁড়লো পলাশী ব্যারাক ও আজিমপুর স্কুলের ভেতর। চতুর্দিক ধোঁয়ায় ভরে গেলো। পরে আকাশের দিকে বেশ কয়টা ট্রেসার বুলেট ছুঁড়লো। তাতে দেখলাম আজিমপুর স্কুলের মাঠে আগুন। একটু ভয় পেলাম কারণ পলাশী ব্যারাক ও আজিমপুর গার্লস স্কুলে সার্জেন্ট জহুর হল, সলিমুল্লাহ হল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্ররাই আশ্রয় নিয়েছিলো। এবার সবাই হানাদারদের আক্রমণে মারা যাবে। প্রায় ভোর ৫টা পর্যন্ত গোলাগুলি সমানে চললো। ফজরের আজানের পর গুলি যেন একটু কমলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নাস্তা খেয়ে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা করছি। এমনি সময় জানতে পেলাম পাশের বাসার এক ছোট মেয়েকে পলাশী থেকে গরুর দুধ আনতে পাঠিয়েছিলেন এক গৃহকর্ত্রী। রাস্তা পার হলেই পলাশী ব্যারাক। এরইমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে অবস্থানরত হানাদাররা দূর থেকে মেয়েটাকে গুলিবিদ্ধ করেছে। বুঝতে পারলাম এবার কলোনীর পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে যাবে। মেয়েটির ঘটনা সবাইকে আতঙ্কিত করে ফেলেছিলো। আমাদের শেলটার মাস্টারকেও দেখলাম, রাতের সেই স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন যেনো এক নিমিষে শেষ হয়ে গেছে। তিনি যেনো ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাই সিদ্ধান্ত নিলাম অন্য কোনো শেল্টারে যাবো। বর্বর বাহিনী একটি পশু পক্ষিও বের হতে দিচ্ছে না। কাজেই এর মধ্যে বের হওয়া মানেই মরণকে হাতে নিয়ে বের হতে হবে। বাইরে কার্ফু। বুঝলাম আমরা যতক্ষণ এই বাড়িতে থাকবো ততক্ষণ ভদ্রলোকের আতঙ্ক কাটবেনা। তাই মনি ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। ছাপড়া

মসজিদের কাছ থেকে রাস্তা পার হবার সময় বর্বররা শতেক খানি গুলি ছুঁড়লো। পার হয়ে পাশের কলোনীর ভিতর দিয়েই শেখ সাহেব বাজার এলাকায় ঢুকলাম। ২৬ মার্চ সারাদিন শেখ সাহেব বাজার, লালবাগ ও জগন্নাথ সাহা রোডেই কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় ঐ এলাকার এক প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় নিলাম। ২৭ মার্চ সকালে মনির বাসায় খাওয়া দাওয়া করে বের হই। ঐদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কার্ফু উঠিয়ে নেয়া হয়। পলাশীর মোড় থেকে সার্জেন্ট জহুর হলের দিকে ঢুকি। দূর থেকেই দেখতে পেলাম ক্যান্টিনের কাছে মাঠে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মানুষের লাশ। ইকবাল হলের গেটে হানাদারদের দেখে সরে এলাম। এরই মধ্যে ঐ পিশাচরা বিকট এক চিৎকার করে বললো, 'হট যাও'। পরমুহূর্তে চাইনিজ অটোমেটিক গান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করলো। আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিসট্যান্ট রেজিস্ট্রার শিকদার সাহেবের বাসায় ঢুকলাম। তারা সারারাত আতঙ্কে কাটিয়েছেন। হানাদার বীরপুরুষরা কিভাবে ইকবাল হলের ঘুমন্ত নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর ট্যাংক, কামান, মর্টার ও মেশিনগানের আক্রমণ করেছে, তা এঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ছাত্রদের মৃত্যুযন্ত্রণা ও বাঁচার আকুতি এবং হানাদারদের বর্বরতা দেখে এরা উদভ্রান্তের মতো হয়ে গেছেন। এখান থেকেই সার্জেন্ট জহুর হলের ৩০১ নাম্বার রুমের জাফর ও 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্য বগুড়ার চিস্তি শাহ হেলালুর রহমানকে (দৈনিক আজাদের সাংবাদিক) কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার বর্ণনা শুনলাম। সেখান থেকে বের হয়ে জগন্নাথ হলের সামনে দিয়ে শহীদ মিনারের কাছে আসি। এরইমধ্যে জগন্নাথ হল ও শহীদ মিনার সংলগ্ন শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা শুনলাম। শ্রদ্ধেয় জি.সি. দেব মারা গেছেন তখনও শুনি নাই। তবে জগন্নাথ হলের ভিতরের রাস্তায় অনেক লাশ দেখেছিলাম। শহীদ মিনারটাকে যেনো উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর দু'দিন পর শহীদ মিনারের উপরে সাইনবোর্ডে বাংলা ও উর্দুতে মসজিদ কথাটি লিখে রাখতে দেখেছি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের গেট বন্ধ করে হানাদার বাহিনীর লোকেরা দাঁড়িয়েছিলো। ওখান থেকে রিক্সা নিয়ে টিকাটুলীতে আমার বাসায় আসি। গোছল করে, ভাত খেয়ে ১১ টার মধ্যে আবারো শেখ সাহেব বাজারে ফিরে আসি। পরে ঢাকা হলের মোড়ে কামরুল আলম খসরু ('নিউক্লিয়াস'র প্রথম সারির সদস্য এবং পরে সিনেমার নায়ক) একটা জীপ চালিয়ে পুরাতন শহরের দিকে যাচ্ছিলো। দেখলাম তার গাড়ির পিছনে কয়েকটা ষ্টেন ও রাইফেল কাপড় দিয়ে ঢাকা। এই সংগৃহীত অস্ত্রগুলো সে জিঞ্জিরার দিকে নিয়ে

যাবে। আমি ও মনি ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরে থাকি। এর মধ্যে বিপ্লবী পরিষদের সদস্য, ছাত্রলীগ কর্মী ও নেতা এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের সংগ্রহ করে জিঞ্জিরায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

২৮ মার্চ মগবাজার গিয়েছিলাম রাতে থাকবো মনে করে। এরই মধ্যে জানতে পারলাম দু'টি ছেলে একজন হানাদার সৈনিকের হাত থেকে একটা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশ্য পাকিস্তানিরা লাইসেন্স করা অস্ত্র ২৭ মার্চ থেকেই থানায় জমা দিতে বলেছিলো। কার্ফুয়ের অবসর সময়ের মধ্যেই জনসাধারণ ঐ অস্ত্র জমা দিতো। আমাদের ছেলেদের ('নিউক্লিয়াস'র) ও আওয়ামী লীগের যুবক কর্মীদের জনগণের ঐ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

৩০ মার্চ দুপুরে মনি, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও নজরুল ইসলামসহ (শহীদ) লালবাগ দিয়ে নদী পার হয়ে কোনাখোলা স্কুলে পৌঁছাই। সেখানে আ.স.ম আবদুর রব, সাজাহান সিরাজ, স্বপন কুমার চৌধুরীর সাথে মিলিত হই। ওখানে ই.পি.আরের ২০ জন বাঙালি সদস্যও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। আলাপ আলোচনা করে সবাইকে ঢাকা শহরের ঘটনা বর্ণনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার দায়িত্ব দিলাম। সিদ্ধান্ত হলো আমরা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র সদস্যরা যে কোনো অবস্থায় দেশের ভিতর থাকবো। শুধুমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন। আরো সিদ্ধান্ত হলো যে, দেশের সর্বত্র পোস্টার, দেয়াল লিখন ও লিফলেটের মাধ্যমে ঢাকা শহরে নৃশংস বর্বরতার কথা তুলে ধরা এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে আ স ম আবদুর রব চাঁদপুরে অবস্থান নিবেন। স্বপন চৌধুরী চট্টগ্রামে, আমি ঢাকায় এবং মনিরুল ইসলাম রাজশাহীতে। মধুপুর গড়ে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আ ফ ম মাহবুবুল হক ও বদিউল আলমের উপর দায়িত্ব পড়লো। আমরা খবর পেয়েছিলাম জয়দেবপুর অবস্থানরত বাঙালি সৈনিকরা মধুপুর গড়ের দিকে অবস্থান নিয়েছে। কোনাখোলা ক্যাম্প থেকে সবাইকে বিদায় দিয়ে বিকালের দিকে রুইতপুর গেলাম। সেখানে 'নিউক্লিয়াস'-এর তিনজন– সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও আমি দেশের ভিতর শেষবারের মত বৈঠকে মিলিত হই। ঠিক হলো আমি ঢাকা শহরের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনায় থাকবো। আবদুর রাজ্জাক ট্রেনিং ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতে যাবেন। সিরাজ ভাই অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণের জন্য সাতক্ষীরায় অবস্থান করবেন।

শেখ মুজিব জানুয়ারির ১২ তারিখে রাজ্জাক ভাই ও সিরাজ ভাইকে আরো দু'জনকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। আমরা তা মেনে নিয়েছিলাম। এরপর থেকে সিরাজ ভাই, শেখ ফজলুল হক মনি, রাজ্জাক ভাই এবং তোফায়েল আহমেদের সাথেও শেখ মুজিব একত্রে বৈঠকে বসতেন। আমাদের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ভারতে তোফায়েল আহমেদকে পাঠাতে হবে। সিদ্ধান্ত হয়, দিল্লি থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদের মধ্যে একটা 'সংকেত' ব্যবহার করা হবে। ঐ 'সংকেতে'ই আমরা বুঝতে পারবো ভারতে প্রবাসী সরকারের অবস্থান, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং অস্ত্র-সস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণে ভারত রাজি হয়েছে। রুইতপুরেই আমার সাথে শেখ মনি ভাই ও তোফায়েলের দেখা হয়। ওখানে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ অনেক আওয়ামী লীগ কর্মীর সাথেও আমার দেখা হয়েছিলো। ওখান থেকে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

পরদিন রুইতপুর চেয়ারম্যানের অফিসে বসে ঢাকা থেকে নিরুদ্দেশের যাত্রী অসহায় পরিবারগুলোর জন্য পানি, শিশুদের জন্য দুধ, রাত্রি যাপন ও আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এসব ব্যবস্থা অবশ্য স্থানীয় চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সেচ্ছাসেবকদের উদ্যোগেই নেয়া হয়েছিলো। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এহিয়া চৌধুরী পিন্টুর সহযোগিতায় এসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিলো। রাতে ইনু ও আম্বিয়াকে রেখে আমি ও পিন্টু বোরহানউদ্দিন গগনের বাড়ি কলাতিয়াতে যাই। ওখানেই দেখা হয় নৌ বাহিনীর ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগের সাথে (মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমান্ডার)। তাকে ঐ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র-যুবক-বিপ্লবী পরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। গভীর রাতে হেলিকপ্টারের শব্দ কানে আসছিলো। ভোরের দিকে গোলাগুলির শব্দও কানে আসলো। সকালে বাইরে বেরিয়ে দেখি জিঞ্জিরার দিক থেকে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসছে। যারা ঢাকা শহর থেকে পালিয়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নিয়েছিলো, তারাও আরেকবার আশ্রয়হারা হলো। শুনলাম গভীর রাতে হেলিকপ্টারে জিঞ্জিরায় প্যারাট্রুপার নামিয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে গণহত্যা চালিয়েছে। আমি এই সংবাদে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সাজাহান সিরাজ রাতে জিঞ্জিরায় ছিলো। আমি আর পিন্টু প্রায় দৌড়িয়ে দু'মাইল পথ অতিক্রম করে রুইতপুর বাজারে আসলাম। জানতে পারলাম, সাজাহান সিরাজ যে বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিলো সেই বাড়িতেই হানাদাররা প্রায় ২১ জন লোককে হত্যা করেছে (পরে

অবশ্য প্রায় পনেরো দিন সাজাহান সিরাজকে খোঁজার পর জানতে পেলাম সে এবং মাযহারুল হক টুলু কোনোক্রমে বের হয়ে আসতে পেরেছিলো)। দূর থেকে মাঠের মধ্যে শত শত মৃতদেহ দেখা যাচ্ছিলো আর তারই মাঝখানে ভীত সন্ত্রস্ত হাজার হাজার পরিবার উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসছে। কেউ আহত ছেলে-মেয়েকে কোলে নিয়ে, কেউ আহত বৃদ্ধ মা-বাবাকে ঘাড়ে নিয়ে, কেউবা আহত স্ত্রীকে, আবার কেউ আহত স্বামীকে বয়ে নিয়ে আসছে। এই নিরুদ্দেশ যাত্রীরা যখন আমাদের কাছে আসছে তখন কেউ তার বাবাকে, কেউ তার মাকে, কেউ বাবা-মাকে বা ছেলে-মেয়েদের খোঁজ করছে। সাধ্যমত ওদের সাহায্য করলাম। সমস্ত জিঞ্জিরাই মনে হচ্ছিলো বহু আগের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক নগরী। সন্ধ্যা পর্যন্ত হায়েনাদের আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসা মানুষের আর্তচিৎকার আর বাঁচার জন্য একটু আশ্রয়ের আকুতি শুনলাম। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় যতদূর সম্ভব খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হলো। এছাড়াও যে পরিবার দেশে যেখানে যেতে চাইলো, তাদেরকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। রাতে আমি আমার সহযোগীদের নিয়ে নবাবগঞ্জ থানার পাড়াগ্রামে পিন্টুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে ঐ রাতে পিন্টুদের পরিবারসহ আশ্রিতের সংখ্যা ছিলো ১০৫ জন। ঐ বাসায় শতাধিক লোকের দু'বেলা খাবার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত গ্রামের লোকেরা সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। রাতে গ্রামে বিভিন্ন বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো। এখানে আমাদের সাথে আশ্রয়ে ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেবসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২/৩ জন শিক্ষক। স্বজন হারা অনেকেই সেদিন এখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। সেদিনের শোক বিহ্বলিত মানুষকে এত সহানুভূতিশীল ও পরোপকারী হতে দেখেছি যে নিজের জাতি সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যায়। আক্রান্ত মানুষের সুদৃঢ় ঐক্য ও প্রতিঘাতের আকাঙ্ক্ষা সেদিন যা দেখেছি, তা কোনোদিন ভোলার নয়।

পাড়াগ্রামে প্রায় ১৫ দিন থাকার পর আমি ইনু ও আম্বিয়াসহ লঞ্চে মানিকগঞ্জের পথে রওনা হই। পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি ফিরে আসি। ইনু ও আম্বিয়া ঘিওর হয়ে পদ্মা নদী পেরিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে চলে যায়। আমি তার দিন সাতেক পর পিন্টু ও মফিজুল ইসলাম কামাল ('৭৩-এর এম.পি.) সহ আমরা মানিকগঞ্জের বালিরটেক, পিপুলিয়া ও লেছরাগঞ্জ (হরিরামপুর) দিয়ে পদ্মা পার হয়ে মোমিনখার হাঁটে পৌঁছাই। ফরিদপুরের কাছে খলিলপুর পার হয়ে যাওয়ার সময় এক গ্রাম্য টাউট আমাদেরকে 'মুক্তি বাহিনী' বলে আটকায়। আমাদেরকে হানাদার বাহিনীর হাতে সোপর্দ করার কথা বলে। এরইমধ্যে গ্রামে বহুলোক ওখানে উপস্থিত হয়।

কয়েকজন ছাত্র-যুবক চুপিসারে আমাকে জানালো লোকটি খুবই খারাপ, হানাদার বাহিনীর দালাল (তখনো দেশের ভিতর রাজাকার, আলবদর ও আল শামস গঠিত হয় নাই), হানাদার বাহিনীর অফিসাররা স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করছিলো। আমি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে পরিচয় দিলাম। বললাম শৈলকুপায় বাড়ি। রেল বাস না থাকায় এদিক দিয়ে যাচ্ছি। লোকটা খুব হম্বি তম্বি করলো কিছুই শুনলো না। অন্যান্যরা নীরব ছিলো। পরিবেশ আমাকে বেশ সাহায্য করলো। আমি তাকে তখন বললাম, এ অঞ্চলে ঢাকায় পড়ে এমন ছাত্র আছে কিনা। বললো, হ্যাঁ এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আছে। আমাদের সেই বাসায় নিয়ে গেলো। দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন। ঐ লোকটা কথা বলার আগেই আমি তাকে বললাম, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শুনলাম আপনার ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাকে একটু ডেকে দিবেন'। ভদ্রলোক সাথে সাথে তার ছেলেকে ডেকে দিলো। ছেলেটি আসলে আড়ালে নিয়ে তাকে ঘটনা বলে, নিজের আসল পরিচয় দিলাম। সে ইকবাল হলের ছাত্র আমার বন্ধু মাসুদ পারভেজের (সিনেমার নায়ক) রুম মেট। মাসুদ পারভেজ একসময় ময়মনসিংহ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলো। একটু আলোচনার পরই ছেলেটি আমাকে চিনতে পরলো। ছেলেটি তার বাবাকে জানালো আমি শিক্ষক। ভদ্রলোক সবাইকে বিদায় দিয়ে আমাদেরকে ছেলের সাথে বাড়ির ভিতর পাঠালেন। বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রায় ২০/২৫ জনকে দেখতে পেলাম। এরা সবাই ঐ বাড়িতে আশ্রিত। রাজেন্দ্র কলেজের একজন শিক্ষকসহ প্রায় সবাই ঢাকা অথবা ফরিদপুর শহরের লোক। ঐ বাসায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বিকালে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টি থামলে ছেলেটি আমাদের নিয়ে রওনা হলো। গ্রামের প্রান্ত সীমায় এসে ক্ষমা চেয়ে বললো, 'ঐ লোকটির ভয়ে আপনাদের এখানে নিয়ে এলাম। ও শহরে গিয়ে হানাদার বাহিনীকে নিয়ে আসতে পারে।' আমরা এক প্রাইমারী স্কুলে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। রাতে ছেলেটি তার বাড়ি থেকে রাতের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ছেলেটি আমাদের বলে গিয়েছিলো, 'হানাদার বাহিনী রাতে এলে, আপনারা ডানদিকে বিলের মধ্যে নেমে পড়বেন। সোজা পশ্চিমে বালিয়াকান্দি।'

ভোর থেকে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ৫ ঘন্টা পর দুপুরের দিকে পৌঁছলাম রমজান ডাকাতের বাড়ি। উঠানে টিউবওয়েল দেখে পানির পিপাসা বেড়ে গেলো। বাড়িতে ঢুকে টিউবওয়েল চেপে অনেক পানি খেলাম দু' জনেই। এরইমধ্যে বিরাট দৈত্যের মত একটা লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা

করলো, 'আপনারা কই থেকে আইলেন। কই যাইবেন।' তাকে বললাম, 'ফরিদপুর থেকে এসেছি, যাব লাঙ্গলবন্ধ।' লোকটি বললো, 'দুপুরে তো খাওয়া পাইবেন না। এখানে চাইট্টা খাইয়া যান। বালিয়াকান্দি আরো সাত মাইল।' আমরা বুঝতে পারলাম এই সেই রমজান ডাকাত। ভাত খেতে রাজি না হওয়ায় লোকটি চিড়া গুড় খাইয়ে ছাড়লো। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলো ঢাকায় কি এখনো যুদ্ধ চলছে। মিলিটারীরা ফরিদপুর ও কামারখালী ঘাটে এসেছে। এখনো বালিয়াকান্দিতে আসেনি। 'আসলে আমার ইচ্ছা আছে পাঞ্জাবীদের সাথে যুদ্ধ করবো। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নেবো। আমার নাম রমজান ডাকাত। আপনারা যাচ্ছেন যান। ট্রেনিং লইয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আমাগো এদিক দিয়া গেলে, দেখা কইরা যাইবেন।' বুঝলাম রমজান আমাদের কোনো কিছুই বিশ্বাস করেনি। ডাকাতের এই ধারণা, মন-মানসিকতা, বিশ্বাস, দেশপ্রেম ও নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে বিমোহিত করলো। জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এত প্রকট এবং অন্ধ আবেগ তাই যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

বালিয়াকান্দি ও লাঙ্গলবন্ধ পার হয়ে সন্ধ্যার পর নড়িয়া বাজারে উপস্থিত হলাম। বাজার জনমানব শূন্য। অনেক খোঁজাখুজির পর এক হিন্দু ভদ্রলোককে পেলাম। ভদ্রলোক স্থানীয় স্কুল শিক্ষক। তিনি আমাদের তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর বৃদ্ধ মা নিজে বসে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে পৌছাই তখন ঐ স্কুল শিক্ষকের বৃদ্ধ মাতাসহ পরিবারের সকলকে নিয়ে রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম,'আমরা আসতে না আসতে এমন কি হয়েছিলো যে আপনারা দেশ ত্যাগ করলেন? ভদ্রলোক বললেন, 'যারা এতোদিন আমাদের সাহস যুগিয়েছে, আমাদের আশাভরসা ও সহযোগিতা দিয়ে রেখেছিলো। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম শহরে তাদের ডাক পড়েছে। তারা শহর থেকে এসে অন্য মানুষ হয়ে গেলো। কিছু কানাঘুষা শুনতে পেলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বাজার লুট হলো। জন্মের পর থেকে যারা একসাথে মানুষ হয়েছি। বিগত চল্লিশটি বছর একসাথে কাটিয়েছি। একদিন আগেও হানাদাররা বাজার ও গ্রাম আক্রমণ করলে প্রতিহত করবার জন্য সারারাত জেগে বাজার পাহারা দিয়েছি। তারাই নিজ হাতে ঐ বাজার লুট করেছে। এই দৃশ্য দেখার পর সবকিছু ফেলে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি।' বুঝলাম হানাদাররা এবার কূট-কৌশল নিচ্ছে বাঙালি জাতিকে

দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাণে বাঙালিকে আবারো আক্রান্ত করবে। কুচক্রী মহলকে মদদ যুগিয়ে হানাদাররা তাদের গণহত্যা পরিচালনা করবে। এখানে পরবর্তীতে হানাদার বাহিনীর সৈনিকরা আবারো এসেছিলো এবং যারা আগেরবার বাজার লুট করেছিলো তাদের তালিকা অনুযায়ী আবারো লুট করতে বললো। ওরা যখন বাজার লুট করছিলো হানাদার বাহিনীর লোকেরা প্রচুর ফটো তুলছিলো। লুটেরাদের এই দৃশ্য আরো উৎসাহিত করলো। পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন তাদেরকে বাজারে আগুন লাগাতে বললো। যেই তারা আগুন লাগালো, অমনি হানাদাররা গুলি করে সকল লুটেরাদের হত্যা করলো। এই ছবিই পাকিস্তানি সরকার বিদেশে ও জাতিসংঘে 'বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে এই যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য ব্যবহার করে।

পথে 'মাছপাড়ায়' কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারি শরণার্থীদের পথ আটকিয়ে টাকা পয়সা ও গহনা পত্র কেড়ে নিচ্ছিলো। আশ্চর্য হলাম দু'মাইলের ব্যবধানে এই বৈপরিত্য দেখে। ঝাউদিয়ায় শরণার্থীদের সেবার ব্যবস্থা আর এখানে লুটপাটের ব্যবস্থা দেখে। শুনেছি পরবর্তীতে এরা শরণার্থীদের হত্যা করে ধনসম্পদ লুট, এমনকি যুবতী বউ বা মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে। এরাই পরে রাজাকার আলবদর ও আলশামস নামের খুনি চক্রের জন্ম দেয়। দেশের সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক দল বাঙালি জাতির শত্রু হিসাবে ভূমিকা রাখে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তথাকথিত 'মহানুভবতার' নিদর্শন সৃষ্টির জন্য ঐ সকল খুনি চক্রকে 'ক্ষমা করা হলে'ও ইতিহাসের পাতা থেকে সেদিনের এই কালিমা মুছে ফেলা যাবে না।

হালসা স্টেশন পার হয়ে সদরপুরের (মিরপুর থানার) দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে আরো এক জায়গায় গ্রাম্য টাউট শরণার্থীদের কাছ থেকে অর্থ ও গহনাপত্র লুট করছে। এরা সশস্ত্র অবস্থায় হাতে রাম-দা ও লাঠি। শরণার্থীদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দেড়শো শরণার্থীকে আটকে রেখেছে। আমি ও কামাল ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওরা একটু আশ্চর্য হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনারা কি চান, আপনারা চলে যান।' আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, 'আমার বাড়ি খয়েরপুর কাজীবাড়ি। এসমস্ত লোকগুলোকে আমি সদরপুর পৌঁছিয়ে দেবো। তোমাদের কোনো আপত্তি আছে।' সবাই একটু ঘাবড়ে গেলো। একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। দূর থেকে একজন তরুণ বললো, 'এরা বোধহয় মুক্তিযোদ্ধা।' এরপরই ওরা সরে গেলো। সবাই নিরাপদে

সদরপুর পৌঁছালো। বুঝলাম এই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকলাপ দুষ্কৃতিকারীদের আতঙ্কের কারণ। সদরপুর এসে শুনলাম গত রাতে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ব্রীজ পাহারারত হানাদার বাহিনীর দু'জন সদস্যকে হত্যা করেছে।

আমি ফুলহরী হয়ে ঝাউদিয়ায় পৌঁছাই। ঝাউদিয়ায় দেখি স্থানীয় জনসাধারণ শরণার্থীদের জন্য খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেছে। ছাত্র ও যুবকরা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ থেকে এই খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই গ্রামেই আমার মায়ের বাড়ি। এই গ্রামের এক সামন্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। আমারও জন্মস্থান এই গ্রামেই। এই গ্রামের ছাত্র যুবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অভিভাবকদের সহায়তায় প্রতিদিন কয়েকশত শরণার্থী রাতে থাকতে পারছে। এদের খাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিশুদের খাবার জন্য গরুর দুধের ব্যবস্থা এরা করেছে। দু'টো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে শরণার্থীদের জন্য। এখানকার এই ব্যবস্থা দেখে বিশ্বাস হলো বাঙালি জাতির মধ্যে যে সহমর্মিতা আছে তা আপদকালীন সময়ে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এদেশের কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদীরা তাদের নিজ স্বার্থে বাঙালির 'জাতীয় ঐক্য'কে প্রতিনিয়ত নষ্ট করার জন্য 'ঔপনিবেশিক প্রশাসন' যন্ত্রের সাহায্যে দেশটাকে পরিচালনা করে। এই গণবিরোধী প্রশাসন যন্ত্র এবং ক্ষমতার উপরতলার ঐ সুবিধাবাদী অগণতান্ত্রিক শক্তি বাঙালি জাতিকে অনৈক্য ও আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে। যার ফলে বাঙালি কখনো সুযোগ পায়নি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে তার চাওয়া পাওয়া বুঝে নেবার। আজ সময় এসেছে বাঙালির 'জাতীয় ঐক্য'কে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ হিসাবে এবং জাতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। আমার বিশ্বাস অচিরেই আমরা 'স্বাধীন' হবো এবং বিশ্বের দরবারে নিজের জাতীয়সত্তা নিয়েই বেঁচে থাকতে পারবো।

এর ফলেই সকাল ১০ টার দিকে হানাদার বাহিনীর লোকেরা এসে আশেপাশের দু'তিনটি গ্রামের ৫০ জন যুবককে ব্রিজের উপর নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। প্রায় ২৫ জন যুবতীকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে। গ্রামগুলোতে প্রায় শ' দেড়েক মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। ধর্ষিতা হয়েছে মা-বোনেরা। বৃদ্ধ ও বালিকারাও হানাদারদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। জানতে পারলাম হানাদারদের এই কাজের সহযোগী ছিলো স্থানীয় চেয়ারম্যান দাখিল ও কোকো নামের দুই ব্যক্তি। পরবর্তীকালে এরা একজন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও অপরজন রাজাকার কমান্ডার হয়েছিলো। যুদ্ধকালীন সময় দু'তিনবার স্থানীয় বি.এল.এফ.-এর নেতা মারফত আলীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো এদেরকে শাস্তি দেয়ার। দু'তিনবার

চেষ্টাও হয়েছিলো। কিন্তু এদের সুসজ্জিত ক্যাম্প ধ্বংস করা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর গঠিত বঙ্গবন্ধু সরকারের তথাকথিত মহানুভবতার (!) ফলে আজো এরা দোর্দণ্ড প্রতাপে এলাকায় বসবাস করছে। আজ সেই মুক্তিযোদ্ধা মারফত আলী তাদের দোসর। চরিত্রের এতখানি অধ:পতন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব হয় আমার জানা ছিলো না। কি বিচিত্র এদেশের মানুষ!

মুক্তিপাগল মানুষের প্রতিরোধ এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ



গার্ড অব অনারে সালাম গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৫ মার্চ কালরাতে (দিবাগত রাত ১১:৩০ মি.) ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, অসহায় মানুষের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করলো। আক্রমণ করলো ঢাকাসহ বাংলাদেশের সকল ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলোতে। ঢাকার লক্ষ্যবস্তু হলো, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিলখানা ই.পি.আর সদর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন। এছাড়াও শহরে 'হিন্দু' এলাকা ও বস্তি এলাকা আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হলো। ভিয়েতনামের এক 'মাইলায়'র ইতিহাসকে ম্লান করে পাকিস্তানি হানাদার পশুরা এই বাংলায় সৃষ্টি করলো শতাধিক 'মাইলাই'। সেই কালরাতেই সারাদেশে সৃষ্টি হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ। ছাত্র, যুবক ও রাজনীতি সচেতন বাঙালি প্রতিরোধের লড়াইয়ে প্রথম কাতারের সৈনিক হলো। ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধিকাংশ বাঙালি সৈনিকরা, ই.পি.আর.-এর সদস্য ও পুলিশের এক বিরাট অংশ। কিন্তু প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. কর্নেল মাসুদুর রহমান ও লে. কর্নেল রেজাউল জলিল এবং ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. ক. কাজী রকিবুদ্দিনের মত অনেক কুলাঙ্গার পাকিস্তানের পক্ষে থেকে গেলো।

২৫ মার্চ '৭১ দুপুরের পরই আ স ম রবকে আমাদের সংগৃহীত আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্রসহ জিঞ্জিরার কাছে কোনাখোলা স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। ৩০ মার্চ আমি ঢাকা শহর ছেড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে কোনাখোলা স্কুলে উপস্থিত হলাম। সেখানে আ স ম রব ও শাজাহান সিরাজসহ ছাত্রলীগ ও 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্যরা ২৫ মার্চ ও ২৬ মার্চ থেকেই অপেক্ষা করছিলো।



দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে আলাপরাত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ

বিপ্লবী পরিষদের কর্মী ও ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা জানিয়ে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরগুলোর দায়িত্ব দিয়ে আমরা যার যার দায়িত্ব অনুয়ায়ী চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। রবকে চাঁদপুরে, মনিরুল ইসলামকে রাজশাহীতে এবং আ ফ ম মাহবুবুল হক ও বদিউল আলমকে জয়দেবপুর শফিউল্লাহর বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি ঢাকা মহানগরের দায়িত্ব নিই। সাজাহান সিরাজ আমার সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ওখান থেকে আমি ঐদিন বিকেলে রুইতপুর বাজারে যাই। সেখানে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল ও শেখ মনি ভাইয়ের সাথে দেখা ও আলোচনা হয়। ঐদিন দেশের ভিতরে 'নিউক্লিয়াস'-এর সর্বশেষ মিটিংয়ে সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই ও আমি বসে জনযুদ্ধের সকল পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। সিদ্ধান্ত ছিলো তোফায়েল ও মনিভাই ভারতে মুজিব ভাইয়ের দেয়া সেই ঠিকানায় যাবেন। এছাড়াও ঐ ঠিকানায় যাবেন কামরুজ্জামান হেনা ভাই ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। ওখানে তাজউদ্দীন আহমেদ ভাইয়েরও আসার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি ২৫ মার্চ রাত ৯টা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তোফায়েল, শেখ মনি, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২৬-২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান-এর প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান শুনলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২৫ মার্চ ময়মনসিংহে ছিলেন। তাই তিনি সময়মত ঢাকায় পৌছাতে পারেননি। তাজউদ্দীন ভাই ২৫ মার্চের রাত সাড়ে আটটায় শেখ মুজিবের বাড়ি থেকে বের হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যার জন্য তার অপেক্ষায় কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর ও ৪ ছাত্র যুবনেতারা ২৮ মার্চ '৭১ পর্যন্ত রুইতপুরে অপেক্ষা করে কলকাতার পথে রওনা হন। পরে জানতে পারি তিনি (তাজউদ্দীন আহমদ) ২৭ মার্চ ফরিদপুর, পরে চুয়াডাঙ্গা হয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত অতিক্রম করে সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় উপস্থিত হন। রুইতপুর থেকে তোফায়েল ও শেখ মনি এবং কামরুজ্জামান হেনা ও মনসুর


লে. কর্নেল এম এ রব
সেনা প্রধান


কর্নেল এম এ জি ওসমানী
প্রধান সেনাপতি
বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী
সদর দপ্তর, মুজিবনগর


গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
উপ-সেনাপ্রধান ও
বিমান বাহিনী প্রধান

আলী ভবানীপুরের ঠিকানার উদ্দেশ্যে কলকাতার পথে রওনা হন। সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক সাতক্ষীরার দিকে রওনা হন। তাঁদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কামরুল আলম খান খসরুও সঙ্গী হলেন। আমি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার পাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা এহিয়া চৌধুরী পিন্টুর বাড়িতে অবস্থান নিলাম। ওপারে সবাই আশ্রয় ও প্রবাসী সরকারের অভ্যন্তরে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আবদুর রাজ্জাক ৬ এপ্রিল সাতক্ষীরা থেকে, সিরাজুল আলম খান মোল্লারহাট থেকে ৩ এপ্রিল এবং আমি ঢাকা থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় পৌছালাম।

তাজউদ্দীন সাহেব সীমান্ত পার হয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মধ্যে কতোজন নেতা এই মুহূর্তে পিণ্ডি সীমান্ত অতিক্রম করেছেন বা নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএদের কতোজন ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত সীমান্তের ওপারে পৌছাতে পেরেছেন সে হিসাব বা খোঁজ খবর না নিয়েই দিল্লিতে যান। তিনি বি.এস.এফের অফিসার রুস্তমজিকে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। রুস্তমজি তার অপারগতা প্রকাশ করে বি.এস.এফের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান গোলাম মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। ১ এপ্রিল তাজউদ্দীন ভাই দিল্লি পৌছেন। তিনি ৩ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন এবং ভারতীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকে বসেন। দিল্লিতে তাজউদ্দীন আহমদ নিজেকে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেন।

৫ এপ্রিল তিনি আকাশবাণী দিল্লি থেকে অস্পষ্ট ও জটিল ভাষণ দেন। আকাশবাণী দিল্লি থেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার' এবং তার

















মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারগণ

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দীনের নাম উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করে। এটা তার রাজনৈতিক সহযোগীদের, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের অন্যান্য দল, মত

ও নেতা-নেতৃত্বকেও বিভ্রান্তিতে ফেলে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও ব্যাপক অংশের ছাত্র-যুবকদের মাঝে তার এই একক সিদ্ধান্ত ও ঘোষণায় সবার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

তাই এর প্রতিবাদে ৭ এপ্রিল আবদুর রাজ্জাকের আহ্বানে কলকাতার ক্রীট স্ট্রিটে এমএলএ হাউজে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কামরুজ্জামান (রাজশাহী)। ওই বৈঠকে ২৬ জন এম.এন.এ. ও এম.পি.এ. উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তাজউদ্দীনের দিল্লী যাওয়া এবং নিজেকে 'প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী'র পরিচয় দেয়াকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রবাসী সরকারের প্রধান ও দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং পাঁচজন মন্ত্রীসহ সরকার গঠন করা হবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম হবেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং তাজউদ্দীন হবেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। শেখ মুজিবই হবেন মুক্তিযুদ্ধের সুপ্রীম কমান্ডার বা সর্বাধিনায়ক। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম হবেন ভারপ্রাপ্ত সর্বাধিনায়ক। সভায় এই প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তখনো পর্যন্ত সৈয়দ নজরুল ও এমএজি ওসমানী কলকাতায় পৌঁছাননি।

৮ এপ্রিল দিল্লি থেকে তাজউদ্দীন সাহেব কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি সকালে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভবানীপুরের সেই ঠিকানায় গিয়ে কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে পান। তিনি ৭ তারিখের মিটিংয়ের বিষয় জেনে চিন্তিত হন এবং ঐদিনই উপস্থিত সকল সদস্যদের সাথে মিলিত হন। কলকাতায় ফিরে তাদের সাথে আলোচনা না করে দিল্লি যাওয়া, নিজে নিজেই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেয়া এবং আকাশবাণী দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভাষণ দেয়ার জন্য লজ্জিত ও দু:খিত বলে জানান। তিনি আরো বলেন যে, 'তা না হলে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাথে গুরুত্ব সহকারে কথা বলতেন না।' সেদিন তাজউদ্দীন সাহেব পার্টির যে কোনো সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। এমনিভাবে তাজউদ্দীন সাহেব ঐ ২৬ এম.এন.এ. ও এম.পি.এ.দের সবাইকে তার পক্ষে টানতে সক্ষম হন। শেখ মুজিবের দেয়া ঠিকানায় না যাওয়া, 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠন না করা ('বিপ্লবী কাউন্সিল' ও 'ওয়ার

কাউন্সিল' এক নয়) এবং খন্দকার মোস্তাককে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা এসবই ছিলো তাজউদ্দীন ভাইয়ের একক সিদ্ধান্ত।

'নিউক্লিয়াস' ও 'বি.এল.এফ'-এর হস্তক্ষেপে ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে 'মন্ত্রী পরিষদ' গঠিত হয় এবং আগরতলা থেকে সর্বপ্রথম প্রবাসী সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৭ এপিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ 'জনগণতান্ত্রিক' সরকার শপথ গ্রহণ করে মেহেরপুর সাবডিভিশনের বৈদ্যনাথ তলায় যার নামকরণ হয় মুজিবনগর। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপ্রধান এবং সর্বাধিনায়ক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী, কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ বৈদেশিকমন্ত্রী। আকাশবাণী আগরতলা ও শিলিগুড়ি থেকে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের টেপ করা ভাষণ প্রচার করা হয়। এই ভাষণে তিনি অধিকৃত বাংলাদেশকে চারটি যুদ্ধাঞ্চলে বিভক্ত করে চারজন অধিনায়কের উপর মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্বভার অর্পণের ঘোষণা দেন। এ চারজন ছিলেন: (১) মেজর জিয়াউর রহমান, (২) মেজর শফিউল্লাহ, (৩) মেজর খালেদ মোশাররফ এবং (৪) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। পরে জুলাই মাসে সমগ্র দেশকে মোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে 'জনযুদ্ধ' (guerilla war) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও সীমিত শক্তি নিয়ে হলেও জুলাই মাসে নৌবাহিনী ও সেপ্টেম্বরে বিমানবাহিনী গঠিত হয় এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

১২ এপ্রিল ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তোফায়েল আহমেদ ও শেখ ফজলুল হক মণি একত্রে বর্ডার পরিদর্শনে যান। পথিমধ্যে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী শেখ মণির মত পরিবর্তনে সক্ষম হন। তাজউদ্দীন সাহেবের স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে সবাই দুর্যোগকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেন।



জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গসহ মাওলানা মান্নান

সেদিনের প্রবাসী সরকারের খুব কাছের লোকরা মনে করেন, তাজউদ্দীন সাহেবের সীমান্ত অতিক্রম করার পর থেকেই পাকিস্তানি আইন ও শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার লক্ষ্যে

'৭০ সালের নির্বাচন ও নির্বাচনী আইন রক্ষার প্রবণতার পিছনে একটি বিশেষ মহল জড়িত ছিলো। তাদের প্ররোচনায় শেখ মুজিব নির্দেশিত 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠন করা হয়নি। তাজউদ্দীনকে তড়িঘড়ি করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর দিল্লী যাওয়ার একমাত্র সঙ্গী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। মোটকথা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান ও মইদুল হাসানকে তাজউদ্দীন আহমদকে ঘিরে নয় মাসের একটি ভিন্ন কার্যক্রমে রত থাকতে দেখা যায়।

এর আগেই বঙ্গবন্ধু '৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও শেখ ফজলুল হক মনির সাথে বসে সম্ভাব্য স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়, মুক্তিযুদ্ধ, প্রবাসী সরকার, ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর মার্চের শেষের দিকে সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীন, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান– এ চারজনের সাথেও আলোচনা করেন এবং সম্ভাব্য পাকিস্তানি হামলার সময় তাঁর অনুপস্থিতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তিনি দেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য

একজন লেখক তার লেখা বইয়ে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মাহুতিকে অস্বীকার করে বলেছেন সর্বসাকুল্যে ত্রিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলো। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে হেয়প্রতিপন্ন করার অধিকার জনগণ কাউকে দেয়নি। ইতিহাস বিকৃত করার চক্রান্তকে এদেশের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের রুখে দাঁড়ানো উচিত। নি:সন্দেহে এই নব্য রাজাকারদের জনগণের এবং আগামী প্রজন্মের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কেউ যদি মোহাইমেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন '৭১ সালে জনাব কোথায় ছিলেন? তিনিতো তাজউদ্দীন সাহেবের প্রথম জীবনের বন্ধু। একজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে '৭১ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন। আর '৬৬ সালে আওয়ামী লীগের নামে ছাপানো 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা' নামক পুস্তক তার ছাপাখানায় ছাপিয়ে খ্যাত হয়েছিলেন। '৭১ সালে হানাদারদের দ্বারা এই ভদ্রলোকের পাটুয়াটুলিস্থ ছাপাখানা ধ্বংস হয়নি বা তাকে মুজিবনগর সরকারের দ্বারস্থ হতে হয়নি বা সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়নি। '৭১ সালে তার রহস্যজনক অবস্থান উৎঘাটিত হওয়া উচিত।

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আর মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'বাংলাদেশে

সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন' বইটিতে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকের প্রবন্ধ রয়েছে। বইটি লেখার প্রাক্কালে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র মো: শাহীন রাজাকে আমার কাছে পাঠান। তখন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। রাজা আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি করালো। মুক্তিযুদ্ধের উপর বলতে হবে। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আমার টিকাটুলির বাসায় এসে অসুস্থতার মধ্যেই সাক্ষাৎকার নিলেন। সম্ভবত: সর্বমোট তিনদিন এসেছিলেন। '৬২ সাল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে সংগঠন, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এর আনুসঙ্গিক বিষয়, সহযোগী শক্তি এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জনযুদ্ধের প্রস্তুতির বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং লিখলেন। বইটি ছাপা হলো '৮৬ সালের মে মাসে। অনেকদিন চলে গেলো, ওরা বইটি আমাকে দিলোও না এবং দেখালোও না। একদিন শাহীন রাজাকে বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে সে বললো, বইটি দেখালে আপনি আমার উপর রাগ করতে পারবেন না! রাজি হলাম। দেখলাম আমার তিনদিনের দীর্ঘ ইন্টারভিউ লেখকের ৩০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে মাত্র ১৩টি লাইনে সীমাবদ্ধ করেছেন। উনি ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং বুদ্ধিজীবী, তারপরও আমি মনে করি ঐ লেখা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার খোরাক জোগাবে না। বরং বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য কাজে দেবে। সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায়, তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, '২৫ মার্চের আকস্মিকতায় কেউ প্রস্তুত ছিলো না'। (বইটির পৃ. ৪২০)

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো একটা প্রচন্ড রকমের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলো দু'লক্ষ যোদ্ধা। আর তাদের ঘিরে আরো তিনলক্ষ মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে যোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলো। জনগণের এক বিরাট অংশ মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের পক্ষে এগিয়ে আসায় হানাদার সৈন্য ও এদেশীয় দালাল ঘাতকদের রোষানলে পড়ে তাদের অনেককেই অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে জীবন দিতে হয়েছিলো। বাংলাদেশে জীবন ও ইজ্জত বাঁচাতে না পেরে প্রায় ১ কোটি বাঙালিকে শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। দু'কোটি মানুষকে দেশের ভিতরে আত্মরক্ষা ও মানসম্মান বাঁচাতে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিলো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। 'জয়বাংলা' ছিলো আমাদের অনুপ্রেরণা ও 'জাতীয় ঐক্যে'র প্রতীক। আমাদের লক্ষ্য ছিলো, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করা। আর অগণতান্ত্রিক, অবৈধ সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে গুড়িয়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়া একান্ত কাম্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সরাসরি তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন না। নয় মাসের কার্যকলাপ, অসীম বীরত্ব, ছাত্র-যুবসমাজের আপোষহীন মনোভাব এবং বীরত্বপূর্ণ অবদান চোখে দেখেননি। এতদসত্ত্বেও তাঁর নামেই সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতি ও রাষ্ট্রের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরিচিতি আছে। পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আর দু'হাজার বছরের বাঙালির 'রাষ্ট্রীয় রাজনীতি' ও জাতিত্ববোধের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পুঁথিতে যে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিলো বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতকে বঙ্গকৌম বা Tribe-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় আর্যগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, আচারঙ্গ, মহাভারত, বোধায়ন ও রামায়ণে। বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা আর মেঘনার অববাহিকা অঞ্চলে বঙ্গকৌম, পরে বঙ্গজনপদ ও গঙ্গারাষ্ট্র এবং আরো পরে বঙ্গরাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সমসাময়িক সময়ে গঙ্গানদীর উত্তরে 'পুণ্ড্র জনপদে' গৌড়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট শশাঙ্ক। পাল রাজারা ৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪ শত বছর গৌড় রাষ্ট্রে রাজত্ব করেছিলো। আর সেন রাজাদের ১০৯৫ সাল থেকে ১৩০০ খ্রি পর্যন্ত সময়ে গৌড় ও বঙ্গ রাজত্ব করে। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত দু'শ বছর স্বাধীন সুলতানী আমল বাংলাকে শাসন করতে সক্ষম হয়। আর দু'শ বছরের মোঘল আমলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ১৫৩৯ থেকে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। সতেরো বছরের নবাবী আমল ১৭৪০-১৭৫১ সাল পর্যন্ত আর ১৯০ বছরের ব্রিটিশ এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ নির্যাতনে দিশেহারা বাংলার জনগণ বার বার কৃষক বিদ্রোহ, রাস বিহারী বসুর 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA) গঠন ও প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠা, '৪২ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রবাসী সরকার ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ইতিহাস ও বিপ্লবী সূর্য সেনের ১৯৩৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে ভারতীয় 'রিপাবলিকান আর্মি' গঠন ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ক্ষুদিরাম, বাঘা যতিন, প্রীতিলতা ও মাতঙ্গিনী হাজরার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টিই হলো ব্রিটিশের divide and rule policy কার্যকর এবং মিস্টার জিন্নাহ্‌র 'দ্বি-জাতিতত্ত্বে'র পাকিস্তানের নীল নকশা বাস্তবায়িত হওয়া। বাংলা বিভক্ত হলো। পশ্চিমাংশ ভারতের আর পূর্বাংশ পাকিস্তানের অংশে পরিণত হলো। পাকিস্তানি শাসকরা ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট থেকে বাংলাকে শাসন শোষণ করা শুরু করে। তারা প্রথম আঘাত হানে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের উপর। শুরু হয় উর্দুকে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা। ৪৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয়। প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র দু'জন গণপরিষদ সদস্য– ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। বাংলা ভাষার প্রতি গণপরিষদ সদস্যদের অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে ছাত্ররা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ১১ মার্চ '৪৮ ভাষা দিবস পালন করে। এর ধারাবাহিকতায় '৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার, রফিক ও সালাউদ্দিনসহ্ অনেকের রক্তে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো। '৬২ সালে আইয়ুবী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং '৬২ এর ১৭ সেপ্টেম্বর অজিউল্লাহ, বাবুল ও মোস্তফার রক্তে 'শিক্ষা সংকোচন নীতি'কে প্রতিরোধ করে 'শিক্ষা পণ্য নয়, সবার জন্য শিক্ষা চাই' নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর '৬৬ সালের 'ছয় দফা'র সংগ্রামে বাঙালির জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়সত্তার বিকাশের ধারায় স্বাধিকার আন্দোলন বেগবান হয় এবং '৬৯ এর ১১ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সমস্ত বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলার ছাত্র সমাজ 'জয়বাংলা', 'তুমি কে আমি কে - বাঙালি বাঙালি', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' এবং 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা' স্লোগানের মাধ্যমে বাঙালির পৃথক জাতীয় সত্তার ঘোষণা দেয়া হয়। '৭০ এর নির্বাচনে ছাত্র সমাজ '৬ দফা', '১১ দফা' কায়েমের স্লোগানের মাধ্যমে '৬ দফা' ও '১১ দফা'কে নির্বাচনী ম্যান্ডেট ঘোষণা, নির্বাচনের ফলাফলে বাঙালি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ্‌মান-এর। পরে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগানের মাধ্যমে জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের ২৪ বছরের ধারাবাহিকতায় উল্লেখযোগ্য ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিলো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। বাঙালিকে সশস্ত্র লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলো। '৬২ সালে 'নিউক্লিয়াস' এবং পরবর্তীতে 'বি.এল.এফ' গঠনের মধ্যদিয়ে ছাত্র-যুব সমাজ

বাঙালির স্বাধীনতাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিতে পেরেছিলো।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোনো চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ছিলো না অথবা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ বা তাদের পোড়ামাটি নীতির কারণে বাঙালি অস্ত্র ধারণ করেছিলো এমনটাও নয়। বরং একটা জাতিকে ধ্বংস করার ২১৪ বছরের উপর্যুপরি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা করা ও স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি করাই ছিলো লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্ত ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশে কখনো নীতি ও আদর্শহীন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা মেনে নেয়া যায় না। শহীদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা আর মা বোনের ইজ্জতের প্রতি গভীর সম্মান দেখাতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশ একটা শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ হতে হবে দারিদ্র্যমুক্ত, খাওয়া-পরা আর কাজের নিশ্চয়তাসহ সবার জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই। আমরা চাই, চিকিৎসা, শিক্ষা আর উন্নত মন-মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে জনগণের সরকার। আমরা চাই, রাষ্ট্র সবার মানবাধিকার নিশ্চিত করবে। সরকারের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মানুষের জীবিকার জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলো দেয়া। জনগণের লক্ষ্য হবে যেনো সুখ-দু:খ সবাই সমানভাবে ভাগ করে নেয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, জনগণের দু:খ-দুর্দশা মোচনের জন্য সরকার। রাষ্ট্রের অর্থহীন সরকারের প্রয়োজনীয়তা কি? আজ যদিও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায়, কিন্তু তার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অগণতান্ত্রিক, অবৈধ, সামরিকতন্ত্রে বিশ্বাসী অথবা ব্যক্তিতন্ত্র, দলীয় সংকীর্ণতা বা নীতিহীন রাজনীতি বিবর্জিত। এই সরকার বাংলাদেশি বা সাম্প্রদায়িক কোনো শক্তি থেকে কতটুকু ভালো তা আমরা দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার বজায় রাখছে।

১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ ছিলো রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক শক্তিই ছিলো এর নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে। বাঙালি জাতি তার জাতীয়সত্তা প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যই অস্ত্র হাতে নিয়েছিলো। অথচ কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানি শাসক চক্রের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার ফসল অথবা পাকিস্তানি শাসকচক্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করলে 'বাংলাদেশের সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না।' এরা আরো মনে করে '৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি না

হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। 'অথবা পাকিস্তান সৃষ্টির পরই বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম ও বিকাশ হয়েছে।' এই ধারার অনুসারীরা 'মুসলিম বাংলা' অথবা অধুনা 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে'র প্রবক্তা। এই ভুল বিশ্বাস থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে যার যে দান তার স্বীকৃতি দিতে হবে। আর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্থপতি। বঙ্গবন্ধুর নামেই সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। আবার বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে প্রবাসী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা, 'নিউক্লিয়াস', 'বি.এল.এফ' দেশের ভিতরে গড়ে ওঠা বাহিনীসমূহের অবদান স্বীকার না করার অর্থ হলো স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃত করা।

অনিবার্য পরিণতি

মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি নিয়ে '৭১ এর শত্রুপক্ষ সিদ্দিক সালিকের লেখা থেকেই আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি। তাঁর ভাষায়: 'চট্টগ্রামে একমাত্র সাফল্য হলো জাহাজ (এম.ভি.সোয়াত) থেকে নয় হাজার টন গোলাবারুদ খালাসের ঘটনাটি। জাহাজটিকে আওয়ামী লীগ সেচ্ছাসেবকরা মধ্য মার্চ থেকে ঘেরাও করে রাখে।' (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল)

'চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনায় আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হই। হতাহতও হয় সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রাম পরিষ্কার করা হয়- ৬ এপ্রিলে, কুষ্টিয়া ১৬ এপ্রিলে এবং পাবনা ১০ এপ্রিলে। অন্যান্য এলাকায় যেখানে আমরা শক্তিশালী ছিলাম সেসব জায়গা বড় ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই দখলে চলে আসে।' ঐ, পৃ-৯৬

'দুই ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানই ছড়ানো-ছিটানোভাবে ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার, জে.সি.ও এবং শুধু কারিগরি ক্ষেত্রে কিছু এন.সি.ও। এর সদর দফতর ছিলো ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জয়দেবপুরের একটি পুরাতন প্রাসাদে। সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটের সাথে যাতে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয় সেজন্য ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। দুই ইস্ট বেঙ্গল এর তিনটি কোম্পানিকে ট্রেনিং এর জন্যে গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে



পাঠানো হয়। চতুর্থ কোম্পানিকে জয়দেবপুরের পুরাতন প্রাসাদে ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টারে রেখে দেয়া হয়।' ঐ, পৃ-৯৭

'এপ্রিলের গোড়ার দিক পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের শতকরা ৯০ জন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গ্যারান্টির ভিত্তিতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। অবশেষে তারা মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ভারতে চলে যান। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য, মুজিবের মুক্তির গুজব ও সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাব বিদ্রোহীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তুললো।... আমার জানামতে মুক্তিবাহিনীর কোনো সদস্য সাধারণ ক্ষমার প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসেনি।' ঐ, পৃ-১২০

'...ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত এক জেনারেল রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আসেন এবং গুজব সম্পর্কে বিশ্বাসজনক মন্তব্য করে বলেন, 'মুজিবকে জীবনে শেষ করার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে শেষ করা অনেক ভালো। কেননা, জীবন্ত মুজিব থেকে মৃত মুজিব অনেক বেশি বিপজ্জনক'। আমি বললাম, 'মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ একবার যদি মুজিব ছাড়া পান এবং তখন কোনো না কোনো অছিলায় তিনি যে ভিন্ন চেহারা দেখাবেন না, তার গ্যারান্টি কোথায়?'।' ঐ, পৃ-১২০-১২১

'নতুন ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আওয়ামী লীগের শূন্য আসন পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের আদেশ দেয়া হয়। জেনারেল ফরমান আলীকে এই আদেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। ... যেসব দক্ষিণপন্থি রাজনীতিবিদরা সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদের তিনি পুরস্কৃত করতে চাইছিলেন। আসন ছিলো স্বল্প কিন্তু আকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। তাই, তিনি দক্ষিণপন্থী সকলকে একসঙ্গে মিলে একটি একক তালিকা প্রণয়ন করতে বলেন। তারা তাদের নিজস্ব নিলাম ডাক দেয় যা এই রকমঃ পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ৪৬; জামায়াতে ইসলামী ৪৪; কাউন্সিল মুসলিম লীগ ২৬; কনভেনশন মুসলিম লীগ ২১ এবং নেজামে ইসলাম পার্টি ১৭। ফরমান তখন সকলকে সন্তুষ্ট করার জন্যে একটি ফর্মূলা বের করার প্রচেষ্টা নেন অবশ্য প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি মনে স্থান দিয়েই। প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা ছিলোঃ মিস্টার নূরুল আমিনকে যথেষ্ট পরিমাণে আসন দিতে হবে যাতে তিনি কেন্দ্রে একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট তিনজন রাজনীতিবিদকে প্রধানমন্ত্রীত্বের টোপ দেখাচ্ছিলেন। এরা তিনজন

হলেন নূরুল আমিন, কাইউম এবং ভূট্টো। আমি জানিনা পিণ্ডিতে এই খেলা কেমন জমেছিলো। তবে ঢাকার ব্যাপারে উপনির্বাচন ছিলো একটি প্রতারণা।' ঐ, পৃ-১২১

'যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতেই পাকিস্তান নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনী নির্মূল হয়ে গেলো। এখন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ভর করছে, জেনারেল নিয়াজী এবং তাঁর ৪৫,০০০ সামরিক, ৭৩,০০০ আধা সামরিক সৈনিকের উপর। জেনারেলের নৈতিক সাহস এবং তাঁর সৈনিকদের দৈহিক শক্তিই বিষয়টির নিস্পত্তি করবে।' ঐ, পৃ-১৪৩

বিপর্যয়ের মুখোমুখি

'ঢাকার জীবন সাংঘাতিক রকমের কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন একটি দিন বাদ যায় না, যে দিন লুট, অগ্নি-সংযোগ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিংবা বোমাবাজির মতো ঘটনা ঘটেনি। ২৩ আক্টোবর দিনের বেলা প্রাক্তন গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে তাঁর বাড়িতে গুলি করে মারা হয়। কয়েকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিস্ফোরক ভর্তি ছিনতাই করা গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এতে পাঁচজন মারা যায় এবং আহত হয় তেরো ব্যক্তি। পরদিন বিশাল স্টেট ব্যাংক ভবনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এরপর গভর্নর হাউজ লাগোয়া ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভবনে অবস্থিত টেলিভিশন কেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

মানুষজন এসব ঘটনায় অভ্যস্ত হয়ে গেলো। কেননা এগুলো ছিলো রোজকার ঘটনা। এরপর বিদ্রোহীরা (মুক্তিযোদ্ধারা) বিদেশের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অসাধারণ ঘটনা ঘটায়। তারা এটা অর্জন করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের টয়লেট বিভাগ উড়িয়ে দিয়ে। এই বিস্ফোরণ ভবনের প্রধান অংশকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এ ক্ষতি মেরামত করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

১১ অক্টোবর বিদ্রোহীরা প্রথমবারের মত ঢাকায় মর্টার ব্যবহার করলো। পি.আই.এ.'র রসুইখানার কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ আমি নিজ কানে শুনি। ঘটনাটি ঘটে রাত ১:৪০ মিনিটে। বিমানবন্দরকে তাক করে অন্ধের মতো লক্ষ্যের প্রতি দু'টো গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। মনে হলো ঢাকার আশপাশ এলাকাও বিদ্রোহীতে ভরে গেছে। মূলতঃ ঢাকার বাইরের এলাকা ছিলো তাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) জন্য নিরাপদ। কারণ, আমাদের অনুসন্ধান ও অপারেশন কেন্দ্রীভূত রেখেছিলাম শহর অভ্যন্তরেই।

বিদ্রোহীরা সিদ্ধিরগঞ্জের প্রধান পাওয়ার হাউজের ক্ষতিসাধন করে এবং বহি:যোগাযোগ ক্যাবল কেটে দেয়। এই ক্ষতি মেরামতে কোনো বাঙালি শ্রমিকের আগ্রহ ছিলো না। পাকিস্তান ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি থেকে দু'জন সহকারি ইঞ্জিনিয়ার, একজন লাইন সুপারিনটেনডেন্ট, একজন সহকারি ফোরম্যান ও একজন লাইনম্যানের একটি দল আনা হয়। তারা কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সময় ৩০ অক্টোবর দিনের বেলায় তাদের উপর বিদ্রোহীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সকলকেই হত্যা করে। বিজয় স্মারক হিসেবে বিদ্রোহীরা একজনের লাশ সঙ্গে নিয়ে যায়। অন্য চারটি লাশ খুঁজে বের করে ৩১ অক্টোবর পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।" *ঐ, পৃ-১২৪*

চূড়ান্ত বিজয়ের আগে মিত্র বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি এ-ই ছিলো অবস্থা।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরো যাঁরা অবদান রেখেছেন

ক. আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের অবদান

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতায় বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সাতদিনব্যাপী মূল কংগ্রেস শেষ হবার পরে ৬ মার্চ '৪৮ সালে পাকিস্তানে বসবাসকারি পার্টি সদস্যরা স্বতন্ত্র সম্মেলনে 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এই সম্মেলনে সাতজনকে নিয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমরেড সাজ্জাদ জহির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে বাংলা কমিটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে যে ক'জন পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে রাজি হন, তাদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (কমিটি) গঠিত হয়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটিতে মোহাম্মদ তোয়াহা, জামাল উদ্দিন বুখারী, মো. ইব্রাহিম, মণি সিং, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, খোকা রায় প্রমূখ। তিন সদস্যের পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন সাজ্জাদ জহির, খোকা রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায়। পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সদস্য হন,



১৯৭১ সনে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভা

সম্পাদক খোকা রায়, সদস্য মণি সিং, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, ফণী গুহ, নিরঞ্জন গুপ্ত, আলতাব আলী, সুবীর চৌধুরী, বিভূতি গুহ, প্রমথ ভৌমিক, অবশী বাগচী, মুকুল সেন, মারুফ হোসেন, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ইয়াকুব মিয়া, আবদুল কাদের চৌধুরী, অমূল্য লাহিড়ী প্রমুখ। পরে তখনকার পূর্ব বাংলায় কাজ করার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হাবিব, আবদুল্লাহ রসুল, ফারুকী, ব্যারিস্টার লতিফ ঢাকায় আসেন, কিন্তু তারা বাংলায় থাকতে না পেরে ফিরে যান। '৪৮ সাল থেকেই ঢাকায় পুলিশ ধর্মঘট এবং চট্টগ্রামে পুলিশের সাথে কৃষকের সংঘর্ষ হয়। এই সমস্ত আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল-মিটিংয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' প্রভৃতি উগ্র ও হঠকারী স্লোগান তোলায় জনমনে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। উভয় পার্টির কর্মীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। '৪৯ সালের শেষভাগে ময়মনসিংহে 'টংক প্রথা'র বিরুদ্ধে হাজং কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। এছাড়াও প্রদেশব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারকে উচ্ছেদের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট ও গোপন ইশ্‌তেহার বিলি করা হয়। পার্টির কমরেডগণ সাহসিকতার সাথে সমস্ত কাজ করলেও সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্ররা গ্রেফতার হয়ে যায়। ফলে জনগণের সাথে দলের দূরত্ব বেড়ে যায়। গ্রেফতারের প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র সমাজ আন্দোলনের ডাক দেয়।

১৯৫৭ সালে (৬-১০ ফেব্রুয়ারি) কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে দলের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বামপন্থীগণ বনাম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সোহরাওয়ার্দী তীব্র সমালোচনার মুখে কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। কাগমারী সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির বিরোধকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ভাসানী '৫৭ সালের ১৮ মার্চ দল থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ৩১ মার্চ ২১ জন এবং আরো পরে ৯ জন সদস্য দলের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ২৬ জুলাই ('৫৭ সালে) ঢাকায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও গণতান্ত্রিক দল (১৯৫৩ সালে সাবেক

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের সভাপতিত্বে অসাম্প্রদায়িক পার্টি 'গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়), উভয় দলের বামপন্থী সদস্যগণ যোগ দেন। ঐ সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি জাতীয় ফ্রন্ট– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। মাওলানা ভাসানী সভাপতি, গণতন্ত্রী দলের নেতা সিলেটের মাহমুদ আলি সাধারণ সম্পাদক এবং হাজী দানেশ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাপের উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে ফুলছড়িতে কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং ঐ সম্মেলনে 'কৃষক সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মাওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করেন। বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের দাবিতে মাওলানা ভাসানী কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে ভারতকে সমর্থন করলে বিশ্বের কমিউনিস্ট শিবির দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এ নীতির প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নে চরম বিরোধিতার জন্ম হয়। মস্কো ও পিকিংপন্থী নামে দুটো গ্রুপের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে '৬৫ সালের সম্মেলনে অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও দলের সভাপতি মাওলানা ভাসানী পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য রুশপন্থী বলে পরিচিত সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক এবং পিকিংপন্থী মো: সুলতান ও রুশপন্থী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিমকে পার্টির যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করলেও ওয়ার্কিং কমিটিতে পিকিংপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় মস্কোপন্থীরা 'তলবি' কাউন্সিলের জন্য চাপ দেয়। '৬৭ সালের ডিসেম্বরে 'তলবি' কাউন্সিলে ন্যাপ থেকে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনসহ কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। কারণ এর আগেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। রুশপন্থীরা তখন রংপুর সম্মেলন বয়কট করেন। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তির ফলেই ন্যাপ থেকে সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়। ন্যাপ (ভাসানী) এর অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন মোহাম্মদ সুলতান। পরে মোহাম্মদ তোয়াহাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এর বিপরীতে রুশপন্থীরা '৬৮ সালের ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারিতে পৃথক সম্মেলনের মাধ্যমে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ন্যাপ (মোজাফফর) গঠন করে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাপের উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে ফুলছড়িতে কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং ঐ সম্মেলনে 'কৃষক সমিতি' গঠিত হয়।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মাওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করেন। বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের দাবিতে মাওলানা ভাসানী কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন। মাওলানা ভাসানীর আহ্বানে সর্বদলীয় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১৯৬৪ সালের ১৮ মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ন্যাপ সংযুক্ত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী গণআন্দোলনের সূচনা করে ন্যাপ এর নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তার আগ পর্যন্ত চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের প্রেক্ষাপটে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'-নীতি পরবর্তীকালে ছাত্রলীগ গণআন্দোলনের পরিকল্পনা করলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সূচিত আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ফলে ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি (১১ দফা) প্রণয়নে আর একটি বাধা অপসারিত হলে ছাত্র ইউনিয়নও (মেনন গ্রুপ/পিকিংপন্থী) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ শরীক হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের একটা ধারণা ছিলো সোহ্রাওয়ার্দী সমর্থক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' চুক্তি বাদ দিতে রাজি হবে না। তাই তারা ১১ দফা প্রণয়নের সময় শর্ত প্রদান করলো, পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি ও বাতিলের কথা ছাত্রলীগ ১১ দফায় স্বীকার করলে তারাও ৬ দফা মেনে নেবে। '৫৬ সালের সোহ্রাওয়ার্দী আওয়ামী লীগ আর '৬৬ সালের শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ এক ছিলো না। ছাত্রলীগ রাজি হয়ে যাওয়ায় ৬ দফাকে '৬৯ এর ১১ দফায় ৩ নম্বর দফায় হুবহু গ্রহণ করা হয় এবং ১০ নং দফায় সিয়াটো, সেন্টোসহ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের কথা বলা হয়। ১১ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন এবং আন্দোলন পরিচালনার সমস্ত কৌশল নির্ধারণ করতেন সিরাজুল আলম খান।

খ. সিরাজ সিকদার ও অন্যান্যদের অবদান

সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে 'টেস্টটিউব গ্রুপ' (মাও চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্র) নামের কর্মীরা ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সিরাজ সিকদার চাকরি উপলক্ষে টেকনাফে থাকাকালে তখন আবু সাঈদের (কর্নেল তাহেরের ভাই) মারফত বার্মার 'কারেন বিদ্রোহী'দের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। '৭১ এর জানুয়ারিতে প্রকাশ্যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। সিরাজ সিকদার ও তার গ্রুপ (পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন) স্বল্প পরিসরে হলেও

কয়েকটি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ আমলে সিরাজ শিকদারকে 'ক্রস ফায়ারে'র নামে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সে মৃত্যুকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে 'কোথায় সিরাজ শিকদার'-এই মন্তব্য করলে জনগণ তা সহজভাবে নিতে পারেনি।

সিরাজ সিকদার ঝালকাটিতে, আবদুল হক যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনায়, মোহাম্মদ তোয়াহা নোয়াখালিতে, দেবেন সিকদার ও আবুল বাশার নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে, নাসিম আলী মুন্সীগঞ্জ ও কালকিনিতে, আবদুল মান্নান ভুঞা শিবপুরে, রফিকুল ইসলাম বাগেরহাটে, কামাল বখ্‌ত সাতক্ষীরায় ও ওহিদুর রহমান নওগাঁয় তাদের গ্রুপ নিয়ে আলাদা আলাদা যুদ্ধ করেন। এই সব কর্মকাণ্ডে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাইতে শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দিতেন। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

গ. দাউদ গ্রুপ

স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা ছাড়াও আরো কিছু প্রচেষ্টার কথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের দাউদ নামের একজন ছাত্র 'দাউদ গ্রুপ' নাম দিয়ে বেশ কিছু ছাত্রকে নিয়ে স্বাধীন বাংলায় বিশ্বাসী একটি সংগঠন দাঁড় করায়। দাউদের বাড়ি ছিলো যশোর জেলায়। তাদের সাথে দু'একবার আমাদের আলাপ আলোচনাও হয়েছিলো।

ঘ. বিচারপতি ইব্রাহীম

আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আইয়ুব খান '৫৮ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে 'এডভাইজরি কাউন্সিল' নামে 'মন্ত্রী পরিষদ' গঠন করেন। এ কে খান, ডা. ইব্রাহীম ও বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেব আইয়ুবের সেই 'এডভাইজরি কাউন্সিলে' জায়গা পান। আইন উপদেষ্টা থেকে মন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতায় বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেব উপলব্ধি করেন যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সামরিক জান্তার খপ্পরে বাঙালি ও পূর্ব পাকিস্তান আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তখন তাঁর মোহভঙ্গ হয়। '৬২ সালে আইয়ুবের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেব পদত্যাগ করেন। তারপর তিনি আইয়ুবের শাসনব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। তিনি প্রায়ই পূর্ব পাকিস্তানকে 'স্বাধীন' করার বক্তব্য দিতেন। ইব্রাহীম সাহেব তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতাদের সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে মত বিনিময় করেন। এ ব্যাপারে মাওলানা ভাসানী ও শেখ

মুজিবের সাথেও তাঁর আলোচনা হয়। তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি মাযহারুল হক বাকী এবং সিরাজুল আলম খান-এর সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাকী সাহেব ও ইব্রাহীম সাহেব স্বাধীনতার প্রশ্নে একই সাথে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের ভেতর প্রায়ই আলোচনায় বসতেন। পরবর্তিতে তিনি এক ইফতার পার্টিতে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' কায়েমের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ইব্রাহীম সাহেবের দশ নম্বর পুরানা পল্টনের বাড়িতে ঐ ইফতার পার্টিতে কামরুদ্দিন আহমেদ (সাবেক রাষ্ট্রদূত), এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (সাংবাদিক), ছাত্রলীগ সভাপতি বাকী, ডাঃ আবু হেনা, খালেদ হাশিম ও আমি উপস্থিত ছিলাম। '৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা প্রচলন সপ্তাহের আলোচনাসভায় বাংলা একাডেমীর বটমূলে ইব্রাহীম সাহেব প্রকাশ্যেই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

ঙ. মনোরঞ্জন ধর ও চিত্তরঞ্জন সূতার

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেয়ার পর শেখ মুজিব জেলে যান। তখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২০ সেল এলাকার দেওয়ানীতে ছিলেন। সে সময় তফশিলী ফেডারেশনের নেতা মনোরঞ্জন ধরও সেখানে ছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙা গড়ার খেলা পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও তাদের হাতের পুতুল মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রের ফল। তাই তাঁরা গণতন্ত্রবিরোধী ঔপনিবেশিকতার প্রতীক পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ যন্ত্রের হাত থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে মুক্ত করে মানচিত্রে নতুন অবস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেন। এর ফলে জেল থেকে বের হয়ে এঁদের সবাইকে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে দেখি। এরই ফলশ্রুতিতে ৩৪ জন সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিসহ শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হতে হয়। আর চিত্তরঞ্জন সূতার ভারতের সমর্থন আদায়ের জন্য শেখ মুজিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ভারতে যান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সমর্থন আদায় সম্ভব হয়েছিলো।

চ. ভারত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা,

মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির উপর পাকিস্তানি হায়েনাদের আক্রমণের সময় যোগ্য প্রতিবেশি হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছিলো। প্রায় ১ কোটি নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বিতাড়িত বাঙালিকে ভারতের মাটিতে আশ্রয় দিয়েছিলো। এই এক কোটি মানুষকে শরণার্থী শিবিরে থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলো। প্রায় এক/দুই লক্ষ ছাত্র-যুবক, আনসার, পুলিশ, ই.পি.আর ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং, ইউনিফর্ম, খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলো। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ওই ৯ মাস যুদ্ধ চলাকালীন রণক্ষেত্রে ভারত খাদ্য সরবরাহ করতে কার্পণ্য করেনি। পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে আহত মুমূর্ষু সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ভারত সরকার সাধ্যমতো করেছিলো। প্রবাসী সরকারকে জায়গা দেয়া ও সবরকম সাহায্য করেছিলো।

ড. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর ফিল্ড হাসপাতাল

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান 'ট্রাস্টি' ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে 'ফিল্ড হাসপাতাল' স্থাপন করে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াবার অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের ভবিষৎ রাষ্ট্রীয় নীতি

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'জাতীয়তাবাদ', সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে রাষ্ট্র ও মূলনীতিগুলোকে ব্যবহার এবং সংবিধান ও অন্যান্য আইনসমূহ ব্যাখ্যা করতে গেলে মূলনীতিগুলো পথ প্রদর্শক হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

সংবিধানে জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'কেই বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং তার বিবর্তনের ধারায় আজকের বাঙালি জাতি আর বাঙালির 'জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ'কে বলা হয়েছে। পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আর দু'হাজার বছরের বাঙালির রাষ্ট্রীয়-রাজনীতি ও জাতিত্ববোধের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পুঁথিতে যে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ছিলো বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও নিদর্শন খোঁজার কোনো উদ্যোগই নেয়া হয় নাই। আমি মনে করি প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার

জন্য মহাস্থানগড়ে খনন কার্য পরিচালনা করলে গৌঢ় ও তমলুক-এর মতো সঠিক ইতিহাস আরো পাওয়া সম্ভব হতো। ইতিহাসের missing links গুলো সংযোজিত হতো। বাংলার অধিকাংশ ইতিহাসই আজো ইতিহাসবিদদের বা গবেষকদের ৫০/৬০ বছরের পুরনো তথ্য ও যুক্তির সীমাবদ্ধ গবেষণার ফসল।

আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত 'সমাজতন্ত্র'র ধারণাটি ছিলো খুবই স্বচ্ছ। মানুষের উপর মানুষের শোষণহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিতে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রবর্তন করা (সংবিধানের ১০ম অনুচ্ছেদ)। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দরিদ্র এবং দেশের প্রায় ৮০% মানুষ গ্রামীণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এরা জমি ও কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এই মানুষদের শতকরা ৯০% মানবেতর জীবনযাপন করে। 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়'- বাংলার এ প্রবাদটি আজো আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। তাই আমাদের দেশের উন্নয়নে গ্রামীণ মানুষ ও গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তিই আমাদের সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র'র জায়গা নির্দিষ্ট করেছে। গত ৪০/৪২ বছরে 'পুঁজিবাদী অর্থনীতি' চালু থাকলেও গ্রাম বাংলায় দেশের শ্রমিক-কৃষকের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং আরো পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে (অনুচ্ছেদ-১১)।

দু:খের বিষয়, বহু বছর পার হতে চললো। কিন্তু গণতন্ত্র আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে নিশ্চিত নয়। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, অগণতান্ত্রিক শক্তি এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি আজও প্রশাসন ও সামরিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই আমাদের 'গণতন্ত্র' মাঝে মাঝে 'শকুনের খাদ্যবস্তু'তে পরিণত হয়। আজ নামমাত্র হলেও দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। কিন্তু পাশাপাশি পরাজিত শত্রুরাও ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ আমাদের দেশে বেশ শক্তি অর্জন করেছে। মাঝে মাঝে দেখি, তারা দেশে আসে, প্রশ্রয় পায়। যারা মি. জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর আজ বাংলাদেশকে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায় অর্থাৎ 'মুসলিম বাংলা' হিসেবে

বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে আছে। কিন্তু তা বিভিন্ন সংশোধনী ও অবৈধ সরকারদের তথাকথিত পার্লামেন্ট দ্বারা আক্রান্ত। ১২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (১) সর্বস্তরের সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে হবে। (২) যে কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। (৩) ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণের প্রবণতা বন্ধ করা হবে। (৪) যে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদের প্রকৃত প্রয়োগ অবশ্যই একটা রাষ্ট্রে ও সমাজে অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানে লেখা থাকলেও তার মৃত্যু হয়েছে। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান যেমন টিকেনি, তেমনি আমাদের সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রধর্মের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে, আমাদের পরিণতি কি হবে, তা বলতে পারছি না।

জমি ও কৃষক

মানব গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আদিরূপই হলো সমাজ। ছোট ছোট জনপদগুলোই একসময় প্রয়োজনের তাগিদে এবং বিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এক সময় 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিমালায় রাজ্য, রাজা, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রশাসন এবং জনগণের রক্ত আর ঘাম নিংড়ানো অর্থ দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হতো। পরবর্তীকালে শক্তিশালী কেন্দ্র ও সেনাবাহিনী এবং আমলা নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ছোট ছোট রাজ্য বা জনপদগুলো রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। অনেক বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও লড়াইয়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে রাষ্ট্রের কাছে সুষ্ঠু গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে সুলতানী আমল ও মোঘল আমলে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে 'স্থানীয় সরকারের প্রাচীন রূপ'। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই জমির মালিক ছিলো কৃষক। তবে জমির উৎপাদনের উপর রাজার বা রাষ্ট্রের একটা অধিকার আছে বলে রাজস্ব হিসাবে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ দিতে হতো। সে নিয়ম সুলতানী ও মোঘল আমলেও ছিলো। মোঘল আমলের শেষে বাংলা থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিলো ৮ লাখ ১৮ হাজার পাউন্ড। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং ক্লাইভের নেতৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ দখল ও দেওয়ানী হাতে পাবার পর কোম্পানির প্রথম লক্ষ্য ছিলো

রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং তার মোটা অংশ বিলাতে পাঠানো। এর ফলে কোম্পানি প্রথম বছরেই আদায় করে ১৪ লাখ ৭০ হাজার পাউন্ড।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইনের মাধ্যমে একটা নতুন জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক অভিশাপ ডেকে আনে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমিদার ও ইজারাদারদের (দেওয়ানী ব্যবস্থায়) জমিতে কোনো স্বত্ব ছিলো না। তাদের উপরে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিলো এবং এ কাজের জন্য তারা মোট আদায়ী টাকার ১১ ভাগের এক ভাগ পেতো কমিশন হিসাবে। জমির মালিক ছিলো আসলে রাইয়ত বা কৃষক। তারাই ভোগ-দখল ও চাষ-বাস করতো; তবে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিতে হতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও ইজারাদারদের জন্ম হলো। তারা ভূসম্পত্তি ভোগ করা, কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার দায়িত্ব পেলো। তখন থেকে তারাই সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দেবে বলে স্থির হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার খুশিমত জমির খাজনা বাড়াতে পারতো। আর নির্দিষ্ট সময়ের (চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের) মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে তাদের জমিদারী সম্পত্তি নিলাম হবে।

বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই জমিদার শ্রেণি একটা মারাত্মক অভিশাপ হয়েই থেকেছে। কোম্পানির প্রয়োজন ছিলো টাকার, তাই কৃষক সমাজের সম্পদ শোষণ করেই যতোবেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করতো। এই নতুন মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করে কোম্পানি সরকারের একটা 'দালাল' গোষ্ঠী হিসাবে জমিদারদের সুযোগ দেয় খুশিমত জমির খাজনা বৃদ্ধি করবার।

১১৭৬ বাংলা সালে দেওয়ানী নেয়ার ৪ বছর পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়। তা সত্ত্বেও পরে রাজস্বের পরিমাণ বাড়তেই থাকে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বছরে ১৭৯৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ লাখ ৯১ হাজার পাউন্ড।

তখন থেকেই বাংলাদেশে নতুন জমিদারী প্রথা এবং একটা 'নতুন জমিদার' শ্রেণির জন্ম হয়। বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই জমিদার শ্রেণি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি হিসাবে কোম্পানির 'দালাল গোষ্ঠী' বলেই কৃষক সমাজে চিহ্নিত ছিলো। খাজনা আদায়ে নিশ্চিত করার জন্য জমিদারদের খাজনা ধার্য করার অধিকারসহ কৃষকদের বেশি করে শোষণ ও দলন করার ক্ষমতা দেয়ার জন্য ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশরা 'হফতম আইন' জারি করে। জমিদারদেরকে

কৃষকদের উচ্ছেদ করার মতো স্বেচ্ছাচারী অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়। আরো বলা হয়, প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না, অন্য জমিদারের জমি চাষ করতে পারবে না, করলে জমিদার তাদের আটক বা কয়েদ করতে পারবে।

এই আইনের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮১২ সালে আরো কঠিন আইন 'পনজম আইন' পাশ করা হয়। এতে জমিদাররা যে কোনো হারে খাজনা নির্ধারণ করার এবং জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদ করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার পায়। ফলে রায়তদের (কৃষকদের) শোষণের জন্য জমিদার ও সরকার ছাড়াও জমিদারদের অনেক পরগাছা মধ্যস্বত্বভোগী শোষকের সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬-৭৭ সালের এক সরকারি হিসাব থেকে দেখা যায় দেড় লক্ষ জমিদারের নিচে নয় লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়েছিলো। একটি জমিদারী এস্টেটের মধ্যে গড়ে ৬টি করে মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়। খাজনা ছাড়াও ছিলো সেলামী, খাজনা বাকি পড়লে টাকায় চার আনা সুদ। নায়েব, গোমস্তা, তহশিলদার, মুহুরী, পাইক ও পেয়াদা সকলকেই পালা পার্বণে খুশি করতে হতো কৃষকদের। এমনকি জমিদার বাড়ির বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও পূজা পার্বণেও কৃষকদের উপর থেকেই টাকা আদায় করা হতো। এমনি অনেক বাজে খাতেও অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা ছিলো। কৃষকদের অনেক সময় বেগার খাটুনিও দিতে হতো ।

এই সমস্ত সামন্তবাদী শোষণ ও সরকারি জুলুম সহ্য করতে না পেরে কৃষকদের মধ্যে অনেক সময়ই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তো। যেমন সন্দ্বীপের আবু তোরাবের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৭), মেদিনীপুরের চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৭০), পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), উত্তরবঙ্গের মজনু শাহর বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৭), কুমিল্লার কালু ফকিরের (১৭৮৭) বিদ্রোহ, বাকেরগঞ্জের বলাকী শাহর বিদ্রোহ, সিলেটের মির্জা রেজা বেগের (১৭৯৯) বিদ্রোহ, ঢাকার হেমায়েত শাহর (১৮০০) বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের টিপু শাহর (১৮২৪-৩৩) বিদ্রোহ, মসলিন তাঁতী ধ্বংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (১৮৬০), জন্তিয়াপুর খাসিয়া বিদ্রোহ (১৭৮৩), ২৪ পরগনার বারাসাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা দিয়ে কৃষক বিদ্রোহ (১৮৩০-৩১), ফরিদপুরের দুদুমিয়ার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮), কৃষক বিদ্রোহ (১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১), পাবনা ও বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), ত্রিপুরা সিলেটের কৃষক বিদ্রোহ (১৮২৬), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৭১,৭৪ এবং ১৮৮০-৮১) প্রভৃতি।

অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে বার বার এই সমস্ত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়ার ফলে ১৮৫৯ সালে 'বঙ্গীয় খাজনা আইন' জারি হলো। এতে রায়ত বা কৃষক রক্ষার আইন হলো বটে কিন্তু তাতে তাদের জমির মালিকানা বা স্বত্বের অধিকার পেলো না। জমিদারী বা সামন্ত প্রথায় প্রজাদের শোষণের জন্য কেবল সরকার ও জমিদারই ছিলো না, জমিদাররা আরো ছয়টি স্তরের মধ্যস্বত্বের জন্ম দেয়।

বার বার কৃষক বিদ্রোহ ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন জারি করতে বাধ্য করে। এ আইনে ১২ বছরের দখলের ফলে প্রজাকে দখলি স্বত্বসহ স্থিতিবান রাইয়ত (জমির স্থায়ী মালিক) বলে গণ্য করা হয়। ফলে রাইয়তের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং জমিদারদের জমিদারী বিক্রি হয়ে গেলেও তার স্বত্ব (কৃষকের মালিকানা) নষ্ট না হওয়ার বিধান কার্যকর হয়। প্রজা তার জমি বন্ধক দেওয়ার অধিকার পেলো। বাকি খাজনার দায়ে তাকে উচ্ছেদ করতে হলে দেওয়ানী আদালতের রায় পেতে হবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

আজো ১১২ বছর আগে জারি করা 'স্থানীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার আইন ও ব্যবস্থা দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালাচ্ছি। ১৮৮৫ সালের 'স্থানীয় সরকার আইনে'র দ্বারা আবারো রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থায় আমাদের সমাজ জীবনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। প্রথমদিকে জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা। পরবর্তীতে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনী প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হবার আইন জারি হয়। ইউনিয়ন বোর্ড বহুদিন কার্যকর থাকার পর ১৯৬২ সাল থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিল ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত,. সুনির্দিষ্ট কাঠামো ধারণ ও তার বিকাশ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগোতে দেয়া হয়নি। কখনো প্রধান ইউনিট হিসাবে জেলা বোর্ড, কখনো উপজেলা, কখনো ইউনিয়ন কাউন্সিলকে প্রধান ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কখনো প্রশাসন ব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে গণপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে দেয়ার চেষ্টা করা হয়নি।

কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়। এমনকি তার রাজনৈতিক স্বাধীনতাও মূল্যহীন হয়ে যায়। তাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জনগণের চাহিদা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তা গ্রহণ ও

কার্যকর করা প্রয়োজন। আজ সময় এসেছে, গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে তোলার এবং তার আর্থিক ও প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার।

শিক্ষা

শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হলো জ্ঞান অর্জন করা। আশা করি এই প্রত্যয় থেকে ভিন্ন কোনো আলোচনা আজ আর কেউ করবে না। তাছাড়া পরলোকে কেমনভাবে সুখী জীবনযাপন করা যাবে এ বিষয়টিও যে কেউ আর আলোচনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে না সেটাও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাহলে আলোচনার সূচনা হতে পারে মাত্র একটি প্রত্যয় থেকে তা হলো, শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে কতখানি সহায়ক হবে। আবার এও অনেকটা অর্থহীন হবে যদি সুনির্দিষ্ট করে না বলা যায় যে, দেশের মূল মানুষ কৃষক-শ্রমিক তথা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি কি ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র থেকে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বেশ একটা বড় অংশ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তৈরি এবং ইহকালের যাবতীয় সুখ-বিলাস ভোগ থেকে শুরু করে সর্বকালের জন্য মসজিদ-মন্দির তৈরিতেও এদের যথেষ্ট আগ্রহী দেখা যায়। শুধু অভিযোগ আকারে শোনা যাচ্ছে তাও নয়, পরিসংখ্যানেও দেখা যাবে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে যারা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত তাদের মধ্যে এক প্রধান অংশ আদৌ নিজ পেশাকে শ্রদ্ধা করেন না। তারা যেনো-তেনো প্রকারে অর্থোপার্জন করে স্ববিরোধী অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দৃশ্যত: ১৯৪৭-এর পরে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে নেই কিন্তু আমাদের নিজস্ব শাসনযন্ত্র গড়ে তুলতে যে শিক্ষাতন্ত্র প্রয়োজন তা মূলত: অনুপস্থিত। '৭১ এর আগ পর্যন্ত আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গতভাবেই দুষেছি, কিন্তু ৭১'এর পর কারে দুষবো? লক্ষ লক্ষ মানুষ যে রক্ত দিলো তা কাদের জন্য? দেশে শিক্ষিত মানুষের হার নির্ধারণে আমরা যেমন এখনো হতাশাজনক অবস্থায় আছি, তেমনি এদেশের মানুষের টাকায় এবং বিদেশ থেকে ধার-কর্জ করে এনে অনেক লোককে উচ্চশিক্ষিত করা হয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের সংখ্যা কি এতোই অল্প যে দেশটার ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের কিছুই করণীয় নেই?

দেশবাসীকে চমকে দেয়ার মতো তাদের অর্জন কি? যে কারণে অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তির সংখ্যাও বিরাজমান কিন্তু বার বার পর্বতের মূষিক প্রসব হচ্ছে কেন? দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গাদা গাদা ডক্টরেটদের ভূমিকা কতোখানি তাও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানতে হবে। তারা আসলে কি করেন? সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই দেশের নামকরা শিক্ষাবিদরা যোগ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনে যে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে শিক্ষার ভূমিকাই প্রধান। তাহলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত বলতে কি বুঝাবে?

এমতাবস্থায়, আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শিক্ষা ব্যবস্থার অভিপ্রায় হবে– (১) 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র আলোকে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো; (২) দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার ভূমিকা নিশ্চিত করা; (৩) দেশের বর্তমান ভূমিব্যবস্থাসহ পুরো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা; এবং সর্বোপরি, (৫) বিশ্ব-বাস্তবতায় মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশকে শিক্ষায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নিশ্চয়ই কোনো অবয়বহীন একটি বাক্য মাত্র নয়; প্রথাগত শিক্ষার তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠী দিয়ে এর সুগভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা কখনই সম্ভব হবে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। এটা হলো রাজনীতি ও দর্শনের ব্যাপার। আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বিশিষ্ট চোর-ডাকাতরাও নির্বাচনে বিপুল অবৈধ অর্থ ও পেশীশক্তি ব্যয় করে নির্বাচিত হয়ে তারস্বরে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নিয়ে হৈ চৈ করে। জাতীয় চেতনা তবেই পুষ্ট হওয়া সম্ভব যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এদেশের শ্রেণি-পেশার মানুষ ও তাদের সমস্যাকে রাষ্ট্রের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা যাবে।

সংসদীয় নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকদের প্রতাপ ও সংসদের অকার্যকারিতার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয় করা দরকার। 'গণতন্ত্র' অর্জন রাজনৈতিক স্বাধীকারের অন্যতম শর্ত। স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম ফসল যে 'সংবিধান'- একথা সেমিনারে সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে সংবিধানেরই বা থাকে কি, গণতন্ত্র চর্চাই বা হবে কিভাবে?

শিক্ষাকে গণমুখী করার অর্থ প্রতি বছর কমবেশি শুভংকরের ফাঁকি দিয়ে, শিক্ষিত

মানুষ বা যারা লেখা-পড়া করতে পারে, এমন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির খতিয়ান পেশ করা নয়, শিক্ষাকে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা গেলো কিনা সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় মেধা ও মনন সমাজের পরিপূর্ণ কল্যাণে ব্যবহারে আমাদের সরকারি বা প্রশাসনিক দক্ষতা বা ক্ষমতা কতখানি? সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আছে, বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে; অথচ বহুবছর যাবৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও তার ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ কেনো আজ মনে হচ্ছে, বর্তমান অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের 'দক্ষতা' বলে তেমন কিছুই নেই।

অতএব, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান এবং জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা ছাড়া একটি জনকল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাবে না। (So, without definite political outlook or orientation, without pro-people political direction a complete pro-people education system cannot be established.)

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যে ঔপনিবেশিক উপাদানগুলো (colonial contents) রয়েছে, তা শিক্ষার্থীকে শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবতে এবং ক্রমে গণবিচ্ছিন্ন হতে শেখায়। দেশে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যাবৃদ্ধি ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মবাণীকে সচেতনভাবে উপেক্ষা করে বিজাতীয় প্রভাবকেই দৃঢ় করে। এতো রক্তক্ষয় করে, একটা দেশ ও দেশের মানুষ যদি পরমুখাপেক্ষিতাকেই জীবনাদর্শ হিসেবে বেছে নিতে প্রবল আগ্রহী হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে, আমরা ইতোমধ্যে অনেক কিছুই হারিয়েছি।

ক্ষমতা এবং সফলতার (Power and prosper) মাঝে শিক্ষার ভূমিকা কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। শুধু মুক্ত বাজারে মুক্তি বললেই হবে না। গ্যাস ও তেল সম্পদ উত্তোলনের একটা ব্যবস্থা হয়তো হবে, কিন্তু এদেশের শ্রমিক-কৃষক এর অংশ পাবে তো? সম্পদ থাকলেই তো হবে না। আগে পাশ্চাত্য দেশ প্রচার করতো আমাদের সম্পদ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কাছে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের প্রাক্তন রাজদূতরা গ্যাস ও তেলের গন্ধে ছুটে আসছে বড় বড় কোম্পানির পক্ষ থেকে। সমগ্র প্রেক্ষাপটটা তাদের হিসেবের মধ্যে এসে গেছে।

১৯৫২ সালে আকরাম খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে বলা হয়, 'ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিলো-ভারতবর্ষে চাকরিপ্রার্থী কিছু কেরানী তৈরি করা'। বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মভিত্তিক শিক্ষাকে পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থার

পরিবর্তে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী করে তুলতে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। রাষ্ট্রভাষাকে বাধ্যতামূলক, ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির কারণে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার এবং আরবী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপন ও পৌর এলাকার কারখানায় শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র ও নার্সারী প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের উপর। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় দশ বছর মেয়াদী সম-মর্যাদার শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়।

১৯৫৭ সালে 'আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন' রিপোর্টে ১১ বছরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়। গণিত বিষয়ে দার্শনিক পদ্ধতি চালু করা হয় এবং ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবেন বলে বলা হয়।

১৯৫৯ সালে (৫ জানুয়ারি) তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক (আইয়ুব খানেরও শিক্ষক) অধ্যাপক এস.এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে 'শরীফ কমিশন' বা 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। এই কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, জাতীয় জীবনে ইংরেজির প্রয়োজন আছে সে জন্য ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় করা হয় এবং বাংলা অক্ষরের সমালোচনা করে উর্দূ অক্ষরের সাথে বাংলা অক্ষরের পরিবর্তন সাধন করে মানোন্নয়ন ঘটিয়ে পাকিস্তানি ভাষাসমূহের উত্তোরণ ঘটানোর প্রস্তাব করা হয়। বলা হয়, শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাকে ধার্মিক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য ব্যয় বহুল করার প্রস্তাব দেয়া হয়। সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় 'এটা অবাস্তব কল্পনা মাত্র'। শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে দু'বছরের স্নাতক ডিগ্রি (পাস) কোর্সকে তিন বছর করা হয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইংরেজিসহ ৮টি পাঠ্য বই চাপিয়ে দেয়া হয়। ইন্টারমিডিয়েট ৮টি পাঠ্য বই এবং স্নাতক ডিগ্রি (পাস) কোর্স তিন বছর করায় বাংলার ছাত্রসমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে '৬২ সালের আগস্ট থেকে ছাত্র আন্দোলনে নামে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর বাবলু, মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহ্‌র রক্তের বিনিময়ে এবং সরকার, ছাত্র ও অভিভাবকদের চাপের মুখে জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা শরীফ কমিশন রিপোর্ট স্থগিত ঘোষণা করে। ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রদের

ইংরেজি দু'টি বই রেখে বাকিগুলো বাতিল করে ডিগ্রি পাস কোর্স তিন বছরের জায়গায় আবারো দু'বছর করা হয়। ডিগ্রি তৃতীয় বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রি পাসের ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্রসমাজ এই স্নাতক ডিগ্রিকে অটো ডিগ্রি (Auto Degree) বলে তখন অভিহিত করতো। আইয়ুবের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে '৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের এই ছাত্র গণআন্দোলনে শরীফ শিক্ষা কমিশনের অপমৃত্যু হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় 'শিক্ষা পণ্য নয়, সবার জন্য শিক্ষা চাই' নীতিই আমাদের সমাজ ও জনগণের কাম্য।

১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯৬৬ সালে সুপারিশ আকারে তা প্রকাশিত হয়। আইয়ুব খান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ছাত্র অসন্তোষের কারণ বের করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কমিশন ছাত্রদের বিরুদ্ধে অনাহুত ও অপ্রীতিকর কিছু মন্তব্য করে এবং শরীফ কমিশনকে সমর্থন করেন। ফলে ছাত্ররা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রত্যাখ্যান করে রাজপথে আন্দোলনে নামে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে এবং '৭৪ সালের ৩০ মে রিপোর্ট পেশ করেন।



১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে সিরাজুল আলম খান

১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন ও আইয়ূব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং সংবিধান রচনা করার জন্য ছাত্রসমাজের আন্দোলন '৬০-এর দশকের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ছাত্রনেতা হিসেবে সিরাজুল আলম খান-এর অনন্য ভূমিকা তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

সিরাজুল আলম খান-এর দৃষ্টিভঙ্গি

বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের 'প্রাণপুরুষ' হিসেবে যদি কাউকে চিন্তা করতে হয়, তবে সিরাজুল আলম খানই সেই ব্যক্তি। তাঁকে আমরা স্বাধীনতার 'রূপকার' হিসেবেও আখ্যায়িত করি।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন বজায় রেখেই বাংলাদেশ শাসিত হওয়ার যে অধ্যায় শুরু হলো তা সিরাজুল আলম খান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি।

১৯৯৭ সাল থেকে তিনি 'দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক' বিবেচনায় '১৪-দফা শাসনতন্ত্র' বিষয়ক প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর এই ১৪-দফা আমাদের স্বাধীনতার বহু অপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণতা আনবে। আমি মনে করি, তাঁর ১৪-দফা প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'যে আইন ও বিধির দ্বারা বিদেশি শাসকেরা শাসন করে সে আইন ও বিধিকে বদলিয়ে নিজেদের উপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই স্বাধীনতার মূলকথা। বিদেশি শাসক বদলিয়ে দেশীয় শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়ে ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা দিয়ে দেশ পরিচালনা করা জনগণের জন্য 'এক ধরনের পরাধীনতা'; যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'অভ্যন্তরীণ পরাধীনতা' (internal colonialism)।'

এই উক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লক্ষ্য স্থির করণে বিরাট উৎসাহের আধার হবে।

শেষ কথা

বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার। আমাদের দু:খ-বেদনা ও প্রত্যয়ী হওয়ার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের যে গুটিকতেক দেশ স্বাধীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আমরা তাদের একটি। কিন্তু দু:খের বিষয়, আমরা ছাড়া বোধহয় অন্য সব দেশেই তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের কথা, শোষকের নিপীড়ন ও বর্বরতার কথা, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের মতো যুদ্ধাপরাধের কথা নিজের জাতিকে ও প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আর প্রজন্ম উদ্দীপ্ত ও গর্বিত হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্ব, কৃতিত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণ করে। বিশ্বের সকল জাতিই নিজেদের সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সফলতা ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে তারা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়তে প্রাথমিক কাজেও হাত দিইনি। আমরা এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ জনগণকে উপহার দিতে পারিনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংবিধানে সংরক্ষণ করেছিলাম– জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে। কিন্তু তাও আজ লজ্জিত হচ্ছে পদে পদে। রাষ্ট্র, সমাজ ও মননে তা সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছিলাম বলেই আমরা তা রক্ষা করতে পারিনি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোনো চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ছিলো না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ বা তাদের পোড়ামাটি নীতির কারণে বাঙালি অস্ত্রধারণ করেছিলো এমনটাও নয়। বরং একটা জাতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা, হাজার বছরে বিভিন্ন শোষক শক্তি বিশেষ করে ২১৪ বছরের উপর্যুপরি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা ও স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাঙালির 'জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ' সৃষ্টি করাই ছিলো স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্ত, ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে, কখনো নীতিহীন, আদর্শহীন, অনর্থক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেয়া যায় না। শহীদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা আর মা বোনের ইজ্জতের প্রতি সম্মান দেখাতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হতে হবে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত। খাদ্য, বস্ত্র ও কাজের নিশ্চয়তাসহ সবার জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা এবং মাথা গৌজার ঠাঁই দিতে বাধ্য

সরকার। মোটকথা, রাষ্ট্র সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য। সরকারের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো– মানুষের জীবিকার জন্য যা যা প্রয়োজন তার যোগান দেয়া। সরকার ও জনগণের লক্ষ্য হবে সুখ-দু:খ সমভাবে ভাগ করে নেয়া। প্রয়োজন জনগণের নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। জনগণের দু:খ-দুর্দশা মোচনের জন্যইতো সরকার। সুতরাং রাষ্ট্রের অর্থহীন সরকারের প্রয়োজনীয়তা কি? ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক ও বৈধ হতে হবে। সরকারকে অবশ্যই সামরিকতন্ত্রে বা ব্যক্তিতন্ত্রে, দলীয় সংকীর্ণতা বা নীতিহীন রাজনীতি বিবর্জিত হতে হবে। সরকার সাম্প্রদায়িক কোন শক্তি থেকে কতটুকু ভালো তা আমরা দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ ছিলো রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক শক্তিই ছিলো এর নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে। বাঙালি জাতি তার 'জাতীয়সত্তা প্রতিষ্ঠা' ও 'জাতীয় রাষ্ট্র' সৃষ্টির জন্যই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। অথচ কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানি শাসক চক্রের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার ফসল অথবা পাকিস্তানি শাসকচক্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করলে-'বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না।'

আজ বিশ্ব মানব সভ্যতার পাশাপাশি আমরা বাঙালিরাও 'একুশ শতকে' এসে উপনীত হয়েছি। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো– যুদ্ধ নয়, বরং শান্তির শ্বেত কপোত হাতে আগামীকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। আমরা বাঙালিরাও রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক জটিলতাকে গণতন্ত্র ও আরো 'উন্নত গণতন্ত্রে'র যাত্রাপথে 'একুশ শতকে'র নতুন পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চাই। আজ সারা বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি আস্থা এবং ইউরো অর্থনীতিতে একক মুদ্রা প্রচলনের বিস্ময়কর পদক্ষেপ আমাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করছে 'সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা' ও 'উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা' বাড়িয়ে এক নতুন মানব বন্ধন রচনা করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে এক ও অভিন্ন মানবসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এমনি করে বর্তমান, অতীতের সাথে সংযুক্ত করেই জাতির ভবিষ্যৎ গড়তে হবে।

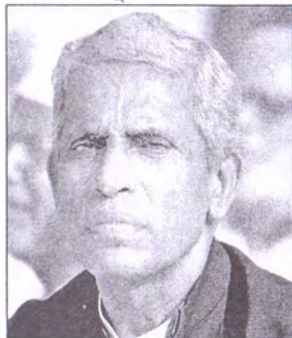
সমাজ বিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের তীব্রতার পটভূমিতেই সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হতে হবে।

প্রামাণ্য তথ্যচিত্র

'নিউক্লিয়াস' এর তিন নেতা



সিরাজুল আলম খান



আবদুর রাজ্জাক



কাজী আরেফ আহমেদ

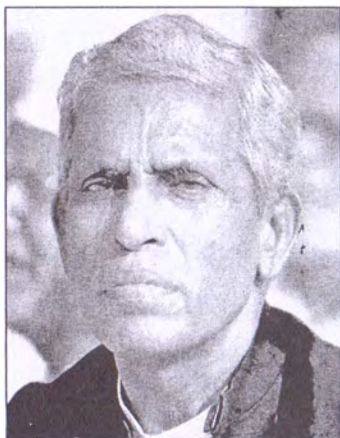
বি.এল.এফ (মুজিব বাহিনী) এর চার নেতা



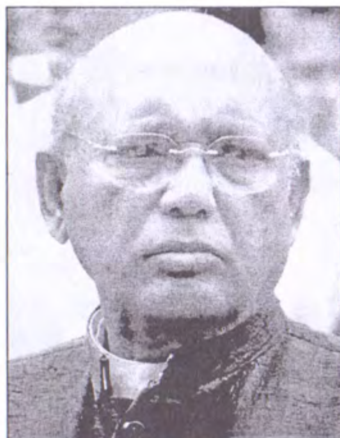
সিরাজুল আলম খান



শেখ ফজলুল হক মণি



আবদুর রাজ্জাক



তোফায়েল আহমেদ



৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, কাগমারী আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সাথে

'৬৯-এর গণ-আন্দোলন


৬ দফা ও '৬৯-এর গণ-আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সরকারি কর্মচারীদের মিছিল


১০ মার্চ ১৯৬৯, রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক



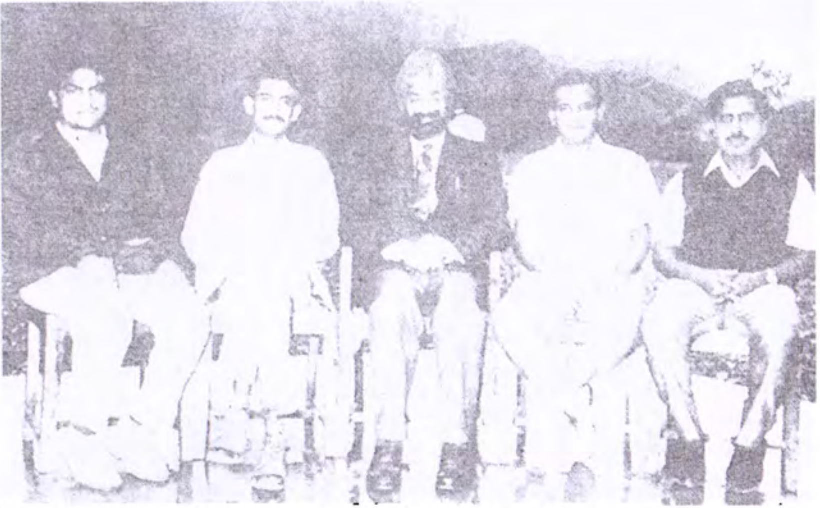
৮ জানুয়ারি ১৯৭০, খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতা



১৯৭০, নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নামলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১২ নভেম্বর ১৯৭০, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনাসহ সমুদ্র উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায় বহু লোকালয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় কয়েক লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু।



বিএলএফ-এর প্রধান প্রশিক্ষক জেনারেল সুজন সিং উবানের সাথে বি.এল.এফ-এর চার প্রধান বাম থেকে সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, জেনারেল সুজন সিং উবান, তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক।



একটি বিশেষ মুহূর্তে বি.এল.এফ নেতৃবৃন্দ- বাম থেকে আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ এবং আবদুল মান্নান (শ্রমিক লীগ)।



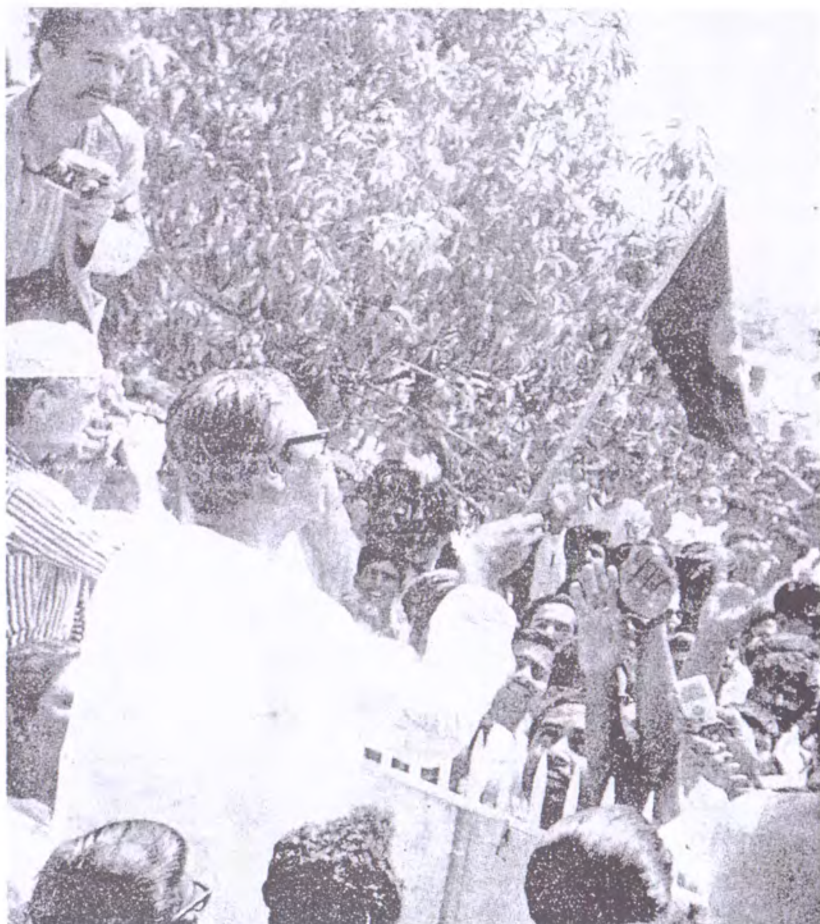
২ মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক ছাত্রজনতার সমাবেশে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন করছেন ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সাজাহান সিরাজ এবং ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন।



ঐতিহাসিক ৩ মার্চ ১৯৭১, পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন (ইশতেহার পাঠের পর) স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ গ্রহণ করেন।



ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ ১৯৭১। জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা- নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনু স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করছেন এবং 'জয়বাংলা বাহিনী'র ডেপুটি কমান্ডার কামরুল আলম খান খসরু 'গান ফায়ার' করে স্বাধীনতার 'এক দফাকে' সামনে এনে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন।



২৩ মার্চ ১৯৭১। ৩২ নং ধানমণ্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু।



১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে পাক হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

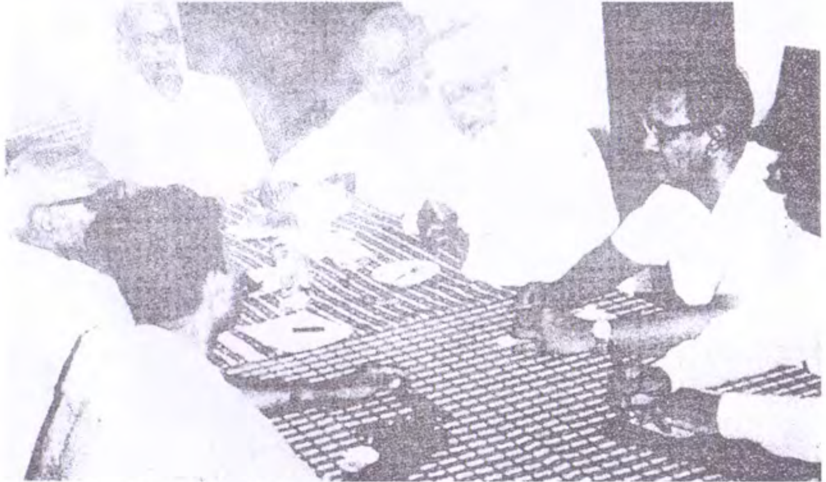




১৭ এপ্রিল ১৯৭১। আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। চুয়াডাঙ্গার আম্রকাননে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। পরে এ স্থানের নাম হয় মুজিবনগর। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে।



প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁর পিছনে কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী।



মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভার সভাপতি মাওলানা ভাসানী, সদস্য মণি সিংহ, মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য।



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করছে দখলদার পাকবাহিনী।



জয় করে মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরে আসছে।



১২ মার্চ ১৯৭২। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ।



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২। সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তথ্যসূত্র:..

১. আব্দুল্লাহ রসুল- 'কৃষক সভার ইতিহাস'।

২. সিদ্দিক সালেক (অনুবাদ: মাসুদুল হক)- নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, ১৯৮৮, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৩. এমআর আখতার মুকুল- আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা।

৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত- বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন।

৫. ড. মেজবাহ কামাল- আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান।

৬. বাংলাদেশের সংবিধান।

৭. কাজী আফরিন জাহান, সহকারী কিউরেটর, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর।

৮. বাংলাপেডিয়া।

৯. http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/pakistan%20National%20Education%20Policy%20Review%20WhitePaper.pdf



কাজী আরেফ আহমেদ (১৯৪২–১৯৯৯খৃ.)

পরিচিত মহলে দৃঢ়চেতা ও সাহসী হিসেবে খ্যাত; কিন্তু জনগণের কাছে কম পরিচিত এক নিবেদিত রাজনীতিবিদের নাম কাজী আরেফ আহমেদ। প্রচার বিমুখ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা সুযোগ-সুবিধার প্রতি নির্মোহ, মৃদু ও স্বল্পভাষী এবং আন্তরিকতা প্রবণ মানুষটি নিজেকে রাজনৈতিক মঞ্চের পেছনে রেখেই নিরলস কাজ করে গেছেন। প্রচার মাধ্যমের শিরোনাম হওয়ার চেষ্টা কখনো করেননি। সস্তা জনপ্রিয়তা পরিহার করেছেন সযত্নে। তবে দল মত নির্বিশেষে ছিলেন সবার প্রিয়। অথচ তাকেই কি না অপ-রাজনীতির শিকার হয়ে একদল ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হলো ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সনে। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

কাজী আরেফ আহমেদের জন্ম ১৯৪২ (খৃ.) সালের ৮ এপ্রিল। বাবার নাম কাজী আবদুল কুদ্দুস, মার নাম খোদেজা খাতুন। পাঁচ ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তাঁর বাবা কলকাতায় অবিভক্ত বাংলার একজন সরকারি কর্মকর্তা (এক্সাইজ ইন্সপেক্টর) ছিলেন। সেখানেই সপরিবারে থাকতেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে এসে কর্মক্ষেত্র সূত্রে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে তারা টিকাটুলিতে ১৪/৩, অভয় দাস লেনের স্থায়ী বাসিন্দা। আদি নিবাস কুষ্টিয়ায়। জন্ম নানার বাড়ি সদর উপজেলার ঝাউদিয়া গ্রামে এবং পৈতৃক সূত্রে ঠিকানা মীরপুর উপজেলার খয়েরপুর গ্রাম।

কিশোর আরেফ

কাজী আরেফের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় প্রথমে পগোজ স্কুলে, পরে ঢাকা



কলেজিয়েট স্কুলে। এ স্কুল থেকেই ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। একই বছর জগন্নাথ কলেজে আই.এস.সি.-তে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বি.এস.সি ডিগ্রি নেয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলে এম.এস.সি.-তে ভর্তি হন। সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে কালো তালিকাভুক্ত হওয়ায় তাঁকে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি। ছাত্র জীবনে একজন পড়ুয়া ছাত্রের পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমান মেধার স্বাক্ষর রাখেন।

ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হবার আগে তিনি স্থানীয় তরুণদের নিয়ে সাহসিকতার সাথে পুরানো ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবেলা করেন। দেশ ভাগ, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, বৈষম্যমূলক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, জাতিগত নিপীড়ন প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে প্রতিবাদী রাজনীতিতে টেনে আনে। জগন্নাথ কলেজ থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত হন। তখনকার ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকা কালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিরাজুল আলম খান'র নেতৃত্বে গঠিত গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' এর প্রথম শীর্ষ তিন নেতার একজন ছিলেন। ষাটের দশকের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিশেষ করে তখনকার দিনে নিষিদ্ধ 'ছয় দফা' আন্দোলনে, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের জঙ্গি মিছিলের সাহসী ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য; আর এর পেছনে উৎসাহ প্রদান ও সকল আয়োজনে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয় নীতি-কৌশল এবং গোপন কর্মকাণ্ডের রূপকার 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। এর মাধ্যমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকা তৈরির প্রাথমিক পর্ব। সিরাজুল আলম খান-এর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো একটি পতাকার ডিজাইন করতে হবে। এতে প্রধান দায়িত্ব পালন করেন 'নিউক্লিয়াস'এর কাজী আরেফ আহমেদ। কাজী আরেফের ভাষায়: '৬ জুন (১৯৭০খৃ.) সন্ধ্যায় সার্জেন্ট জহুরুল হক (তখনকার ইকবাল) হলের ১১৬ নং রুমে আমি (কাজী আরেফ) মনিরুল

ইসলাম (মার্শাল মনি), আ স ম আবদুর রব ও সাজাহান সিরাজকে ডেকে 'জয় বাংলা ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ' তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালাম। এবং এই ফ্ল্যাগই যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সম্মান লাভ করবে তাও জানালাম। রব ও মার্শাল মনি বললো পতাকার 'বটলগ্রিন' জমিনের কথা এবং সাজাহান সিরাজ অনুরোধ জানালো 'রক্তলাল' একটা কিছু যেনো পতাকায় থাকে। আমি ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে বটলগ্রিন জমিনের মাঝখানে গোলাকার রক্ত লাল রঙের উদিত প্রভাত সূর্য এঁকে সবাইকে দেখাই। সবাই একমত হলে ... আমি সবাইকে বললাম ঐ পতাকার মাঝখানে সোনালী রংএর (বাংলার তৎকালীন অর্থকরী সম্পদ সোনালী আঁশ পাট ও পাকা ধান ক্ষেতের রং) বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা থাকবে। পতাকায় ভূখণ্ডের মানচিত্র সুনির্দিষ্টভাবে থাকলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবে না।" তাঁর এই অখণ্ডনীয় যুক্তি এবং সুদূর-প্রসারী চিন্তা সবাই মেনে নেন। তাঁর রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক নীতিনির্ধারণী ও প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এ রকম অসংখ্য গল্প বলা যায়। তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

১৯৬৬ সনে ছয় দফা আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'র পক্ষে 'জয়বাংলা বাহিনী' গঠন এবং এর 'ব্যাটালিয়ান ফ্ল্যাগ' ডিজাইন ও তৈরির দায়িত্ব পালন করেন। এই বাহিনী পরে 'বি.এল.এফ.' এবং এই পতাকা 'জাতীয় পতাকায়' রূপান্তরিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন 'বি.এল.এফ.' বা 'মুজিব বাহিনী'র গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ও ছাত্রলীগের সমন্বয়কের দায়িত্বে নিয়োজিত।

১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং জাতীয় কৃষক লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭২–'৭৫ সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে 'বিপ্লবী গণআন্দোলন' সংগঠিত ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতার পর জাতীয় দৈনিক পত্রিকা 'গণকণ্ঠ'-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অবৈধ ক্ষমতা দখল ও সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন



করেন। তাঁর নীতি-কৌশলের ভিত্তিতেই মতৈক্যের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও জাসদ ১৯৮০ সালে দশ-দলীয় ঐক্যে যোগ দেয়।

'এরশাদের স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের সময়, '৮৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বাম ঐক্যের বদলে আওয়ামী লীগের সংগে নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন, তবে দল ৫ দলীয় বাম ঐক্যের লাইন অনুসরণ করে।' '৮৭ সালের জুনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং নয় মাস কারাভোগের পর '৮৮ সালের ২৯ মার্চ তিনি মুক্তি পান।

১৯৯০ এর দশকের শুরুতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন' ও 'ঘাতক-দালাল নির্মূল' 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠনে নেতৃত্ব দেন। তখনকার ঘাতক-দালাল বিরোধী লড়াইয়ে ব্যাপক সাড়া জাগানো সংগঠন 'মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ড' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

'মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি কাজী আরেফের প্রতিশ্রুতি ছিলো দৃঢ়। ১৯৯১ সালে গোলাম আজমকে জামায়াতের আমীর করার পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির ভিতর গভীর ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। কাজী আরেফ আরো অনেকের সহযোগিতা নিয়ে ৯ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন প্রভৃতি সামাজিক সংগঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারগণকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। একই সময়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে কর্নেল নুরুজ্জামানের উদ্যোগে '৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। ১১ জানুয়ারি তাহের মিলনায়তনে উভয় কমিটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করে; জাহানারা ইমাম আহ্বায়ক এবং অধ্যাপক মান্নান চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ঐতিহাসিক গণআদালতে গোলাম আজমের বিচারের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে গতি


জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা সভায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় বীর শহীদ কাজী আরেফ আহমেদ

সঞ্চারিত হয় তা নবম সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে পরিণতি লাভ করে।'

'কাজী আরেফ কখনই বিশ্বাস করতেন না, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও বিপক্ষের শক্তির কোনো মিল হতে পারে। উনি সেটা প্রমাণ করেছেন, উনার কর্মকাণ্ড দিয়ে। অনেকে যখন দোদুল্যমান ছিলো, উনি তখন অনড় ছিলেন। আজ আরিফ ভাই নেই আমাদের মাঝে, কিন্তু তাঁর প্রভাব রয়েছে সমকালীন রাজনীতিতে। এভাবেই উনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে।' - শরীফ নুরুল আম্বিয়া, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ

কাজী আরেফ আহমেদ সংসার ধর্মও পালন করেন। তাঁর স্ত্রী ও রাজনৈতিক সহকর্মী রওশন জাহান সাথী, যশোরের প্রখ্যাত রাজনীতিক মরহুম এডভোকেট মোশাররফ হোসেনের জ্যেষ্ঠ কন্যা *(দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনিও স্বাধীন বাংলাদেশে, ১৯৭৪ সালে ঘাতকদের হাতে নিহত হন)*। তাঁদের এক মেয়ে– জুলি এবং এক ছেলে– অরূপ। ঘাতকদের হাতে তাঁর অকাল প্রয়াণের অপূরণীয় ক্ষতি নারীত্বের সহজাত গুণ– সহনশীলতার কারণে সাথী ও জুলি খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও



অরূপ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর অনুপস্থিতি অরূপকে যেমন জীবন বিমুখ করে ফেলেছে, তেমনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশও আজ অভিভাবকশূন্য এবং বিভ্রান্ত। কবে এর অবসান হবে কে জানে!

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে তাঁর অনন্য অবদান তাঁকে জাতীয় নেতার আসন দিয়েছে। নি:সন্দেহে ইতিহাস তাঁকে সেভাবেই বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন হিসেবেই মূল্যায়ন করবে। দেশের প্রয়োজনেই একজন ত্যাগী ও আদর্শবান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর ওপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সংগ্রামী অভিবাদন জানাই!

মৃত্যুকালে কাজী আরেফ আহমেদ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য কোনো ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদ রেখে না গেলেও জাতির জন্য রেখে গেছেন নিজ হাতে লেখা 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' শীর্ষক একটি পাণ্ডুলিপি, যা জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশনায় সাহায্য করবে অনন্তকাল। -সম্পাদক



সম্পাদক পরিচিতি



স্কোয়াড্রন লিডার আহ্‌সান উল্লাহ (অব.)

জন্ম কুমিল্লা জেলার নাংগলকোট উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে (মৌজা নং ৫২৪/১৩৬) ২৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১০ ডিসেম্বর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। পিতা মরহুম হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মাতা মরহুমা বেগম আরাফাতুন্নিসা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংরেজি এবং শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, আইনবিজ্ঞান ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন করেন। 'এ্যাডভান্সড্ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ' এবং 'পুস্তক রচনা, সম্পাদনা ও অনুবাদ' এর উপর প্রশিক্ষণ নেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী।

ছাত্র জীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলে স্কাউট, কলেজে ইউওটিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নাট্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনে, ১৯৭০-এ 'নিউক্লিয়াসে' ('স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ') এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী মরহুম প্রফেসর এম ইউ আহমেদের সহকারি এবং মেডিস্টিক সাইকোথেরাপীর শিক্ষানবীস হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রার 'কেসহিস্ট্রি' লেখকদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। বাংলাদেশে অনাথ শিশু সদন ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের শিল্প-কারখানায়

শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি, বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলাদেশে নবজাত শিশুর পুষ্টি এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে (শিক্ষা শাখায়) যোগ দেন এবং ২০০৫ সালে অবসর পান। বর্তমানে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক কাজ করছেন।

তিনি মননশীল ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং ভাষান্তরে আগ্রহী। তাঁর ভাষান্তর করা ওয়ার্লড ক্লাসিক হিসেবে খ্যাত *'স্যামুয়েল হানটিংটনের দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্‌স এন্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার এবং লিও ট্রটস্কির মাই লাইফ'* অঙ্কুর প্রকাশনী কর্তৃক ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। *'এ্যালভিন টফলারের দ্য থার্ড ওয়েভ, ওয়ার এন্ড এন্টি-ওয়ার, হ্যারল্ড লাস্কির এ গ্রামার অব পলিটিক্স'*, শিক্ষা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান নিয়ে লেখা *'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা'* এবং তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধ সংকলন *'মুক্তিযুদ্ধ এবং খোলাচিঠি'* প্রকাশের অপেক্ষায়। এছাড়া, সিরাজুল আলম খান-এর 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট', দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি, গণরায় প্রভৃতি পুস্তিকাও তিনি সম্পাদনা করেন।



বাঙালির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় স্মরণীয় যাঁরা

